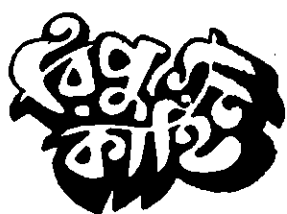
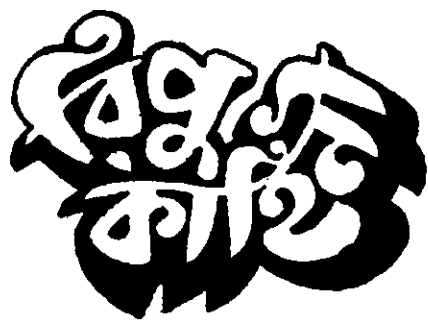


BanglaBook.org

শফিক রেহমান

বৈষ্ণব কাহিনী





শফিক রেহমান

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

রচনাকাল

১৯৬৮-৭০

প্রথম প্রকাশ

জুন ১৯৭২

দ্বিতীয় সংস্করণ

ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

প্রকাশ

যায়যায়দিন প্রকাশনী

৭০, কাকরাইল

ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ

কাইয়ুম চৌধুরী

মুদ্রণ

আনন্দ প্রিন্টার্স

১৪৪, আরামবাগ

ঢাকা

মূল্য ১ টাকা

ISBN 984-478-004-7

ওয়াহিদুর রহমান খান

মিঃ আবু লতিফ সরকার পিইপি-র ঢাকা ব্রাঞ্চের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার। পিইপি'র পুরো নাম হচ্ছে পাকিস্তান ইলেকট্রিক্যাল প্রডাক্টস। আর পাকিস্তান ইলেকট্রিক্যাল প্রডাক্টস হচ্ছে জিইপি অর্থাৎ জার্মান ইলেকট্রিক্যাল প্রডাক্টস নামে কম্পানির ঢাকার শাখা। পিইপি'র মতো জিইপি'র ব্রাঞ্চ পৃথিবীর বহু দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। জার্মানীর ডুসেলডর্ফ শহরে এই আন্তর্জাতিক কম্পানির হেড অফিস।

সেখানে মাঝে মাঝে ছোট্ট ছোট্ট করেন আবু লতিফ সরকারের উপরস্থ কর্মচারী মিঃ মোহাম্মদ আফতাব আলী গায়েন। মিঃ গায়েন ঢাকার জেনারেল ম্যানেজার তো বটেই। তাছাড়া এই কম্পানির সঙ্গে বহুদিন জড়িত থাকার ফলে আপাতত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সব ব্রাঞ্চগুলো তদারকির ভার পেয়েছিল। অর্থাৎ মিঃ গায়েন ভীষণ রকমের উপযুক্ত লোক। তাই তাকে ঢাকায় পাওয়া দুর্লভ। কোথাও না কোথাও সব সময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

ফলে আবু লতিফ সরকার ডেপুটি হওয়া সত্ত্বেও প্রায় সময়ই ম্যানেজারের ক্ষমতা লাভ করেন এবং সে সব সময় তিনি দক্ষতার পরিচয় দেবার ফলে মিঃ গায়েনের অপারিসীম বিশ্বাসের পাত্র হন। বলা বাহুল্য মিঃ গায়েনের সাময়িক অনুপস্থিতির সময় আবু লতিফ সরকার অফিসে কাজ করে সর্বাধিক আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন। পিইপি বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের বহু অংশেই সরকারি প্রজেক্টে কাজ করছে। এ ছাড়াও তাদের তেজগাঁয়ের ফ্যাক্টরিতে তৈরি ইলেকট্রিক্যাল জিনিসপত্রগুলোর বাজারে সুনাম হওয়ায় বেশ বিক্রি হচ্ছে। সুতরাং যে পিইপি উনিশ শো আটান্ন সনে মাত্র সোয়াশো কর্মচারী নিয়ে শুরু হয়েছিলো সেই পিইপিতে এখন প্রায় হাজার কর্মচারী কাজ করেন। মিঃ গায়েনের অবর্তমানে এতো বড়ো প্রতিষ্ঠানের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হিসেবে কাজ করে সত্যিই হুট হুটেন আবু লতিফ সরকার।

অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে মিঃ গায়েন যখন ঢাকায় থাকেন তখন আবু লতিফ সরকার অসুখী থাকেন। তখনো তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে কাজ করতেন। কারণ মিঃ গায়েন দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকতেন বলে তখনো তিনি সরকারের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হতেন। এছাড়া মিঃ গায়েন জানতেন সরকার কখনো ব্যক্তিগত স্বার্থে তার আস্থা ভঙ্গ করবেন না। গোড়া থেকেই সরকার এই কম্পানির সঙ্গে কাজ করছেন এবং অনেকটা গায়েনেরই শুভেচ্ছায় বর্তমানে এতো উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আছেন। আবু লতিফ সরকারের সময়ানুবর্তিতার কথা সুকলেই জানেন। তাছাড়া তিনি কবে যে ক্যাজুয়াল লিভ কিংবা মেডিক্যাল লিভ নিয়েছেন তা বলতে হলে কম্পানির পার্সোনেল ম্যানেজারের অফিসে গিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত ফাইল ঘাঁটতে হবে। মিঃ গায়েন ডুসেলডর্ফে হোম অফিসের সঙ্গে বর্তমানে আলোচনা চালাচ্ছেন ব্যাংককে তার আর্থিক অফিস প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে। তখন সরকারকে পিইপি'র জেনারেল ম্যানেজার করার বিষয়ে মিঃ গায়েনের কোনো দ্বিধা নেই। আবু লতিফ সরকার এ নিয়ে বেশি চিন্তা করতেন না। তিনি তার বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু সেদিন সকালে অফিসে এক সমস্যার উদ্ভব হলো। মতিঝিল কর্মশালায় এরিয়ার একটি বৃহৎ অটোলিকার পুরো প্রথম তিনটি তলা জুড়ে পিইপি-র অফিস। দোতলায় বসেন আবু লতিফ

সরকার। সেদিন সকালে ঘরে ঢুকে টেবলের ওর তাঁর ব্রিফকেসটা নামিয়ে রাখতেই ইন্টারকম বেজে উঠলো। ফোনে ভেসে এলো পার্সোনেল ম্যানেজার আক্বাস মোহাম্মদের গলা।

গুড মর্নিং স্যার। শুনেছেন নাকি খবরটা?

কি খবর আক্বাস?

অ্যাসিট্যান্ট ক্যাশিয়ার তোরাব আলীর ক্যাশ পাওয়া যাচ্ছে না।

তার মানে?

মানে স্যার কম্পানির কাজ চালানোর জন্যে তোরাব আলীর কাছে এক হাজার টাকা ছিলো। আজ হেড ক্যাশিয়ার ভোরে এসেই তোরাব আলীকে তার ক্যাশ বাস্তবে খুলে হাজার টাকা গুণে দেখাতে বলেন। তোরাব আলী এই হঠাৎ আদেশে থতোমতো খেয়ে যায়। প্রথমে বলে বাস্তবের চাবি বাড়িতে ফেলে এসেছে। হেড ক্যাশিয়ার তখন তাকে আরেকটি ক্লার্কের সঙ্গে চাবি আনতে বাড়ি পাঠিয়ে দেন। কিছুক্ষণ পরে ঘুরে এসে ও সব স্বীকার করেছে। বাস্তব খুলে দেখা গেছে একটি পয়সাও নেই তাতে।

তারপর?

হেড ক্যাশিয়ার ওকে সঙ্গে সঙ্গে ডিসমিস করবার জন্যে আমার উপদেশ চেয়েছিলেন। ক্যাশ এমবেজেলমেন্টের ক্রিয়ার কাট কেস। তোরাব আলী ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি হোক বা নাই হোক, ডিসমিস করার কোনো বাধা নেই। সুতরাং ওকে ডিসমিস করার মেমো আপনার কাছে কিছুক্ষণের মধ্যে আসছে। খুবই আশ্চর্যের কথা নয় কি স্যার?

আশ্চর্যের কথা? না আমি বিশেষ আশ্চর্য হই নি। বলতে পারো খুবই দুঃখের কথা। তোরাব আলীর ছেলেমেয়ে ক'জন?

তা স্যার ঠিকই বলেছেন। চারটি ছেলেমেয়ে ছাড়াও দুতিনটে আত্মীয়কে মানুষ করছে শুনলাম। এই বাজারে আরেকটা চাকরি পাওয়াও তো মুশকিল।

হঁ, তা ঠিক। কিন্তু চুরি কেন করেছে শুনেছো কিছু?

ঠিক কেন যে করেছে এখনো জানি না স্যার। তবে কানা ঘুষোয় শুনলাম তোরাব আলী কিছুদিন হয় সাইড বিজনেস করছিলো।

কি রকম সাইড বিজনেস?

খানতিনেক রিকশা ভাড়াই খাটাচ্ছিলো। রিকশার লাইসেন্স বোধ হয় পাঁচ টাকা। কিন্তু ও বের করতে লাগে নগদ হাজার টাকা। শুনছি ওই লাইসেন্স বের করতেই টাকাগুলো নিয়েছে। বড় সাহেব নিশ্চয়ই খুশি হবেন খবরটা শুনে।

আবুলতফিক সরকার সে কথার জবাব না দিয়ে স্টেশনটা ছেড়ে দিলেন। বড়ো সাহেব মিঃ গায়েন আপাতত বিদেশে। আক্বাস মোহাম্মদ ঠিকই বলছে। মিঃ গায়েন খুবই খুশি হবেন এ খবর শুনে। কারণ কিছুদিন আগে তোরাব আলী কম্পানিকে ঘেরাও করে বেশ অসুবিধেয় ফেলেছিলো। মিঃ গায়েন জীবনে সব চাইতে বেশি ভয় করেন স্ট্রাইককে। তার নিজের উন্নতির অন্যতম কারণই এই যে তার অধীনস্থ জিইপি'র কোনো শাখাতেই কোনোদিনও স্ট্রাইক হয়নি। সুতরাং শেষ পর্যন্ত তিনি লোয়ার গ্রেডের কর্মচারীদের ন্যূনতম মাইনে মাসিক দেড়শো টাকায় উন্নীত করে স্ট্রাইক এড়িয়েছিলেন।

ঠিক সে সময়ে তোরাব আলী পরোক্ষভাবে নিজের জন্য কিছু টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন।

বিনিময়ে সে স্ট্রাইকের হুমকি তুলে নেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। মিঃ গায়েন এবং সরকার তাতে রাজি হননি। তোরাব আলীর এই দিকটির সঙ্গে আবু লতিফ সরকার পরিচিত ছিলেন বলে তিনি তার চুরির সংবাদে আশ্চর্য হননি। ইউনিভার্সিটি হতে আদর্শনিষ্ঠ যুবকরা যতোদিন না ট্রেড ইউনিয়নিজমে যোগ দিচ্ছে ততোদিন যে দেশের শ্রমিক সমাজের উন্নতি হবে না সে কথা তিনি বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সরকার বোতাম টিপে সেক্রেটারিকে ডেকে এনে সেদিনের সকালের চিঠিপত্রের উত্তর ডিষ্টেট করতে থাকেন।

লাঞ্ছের কিছু আগে তখন। অপারেটর জানালো বাড়ি থেকে ফোন এসেছে। আবু লতিফ সরকার ফোন তুলে নিয়েই জিজ্ঞাসা করলেন :

কি খবর মালেকা?

প্রত্যুত্তরে ভেসে এলো কোনো এক নারীর একরাশ খিলখিল হাসির শব্দ। আবু লতিফ সরকার সচকিত হলেন। বাড়ি থেকে আসা মানেই তার স্ত্রী মালেকার ফোন। মালেকা বলে থাকে জিন্মা এ্যাভিনিউর সাগর কলা কিংবা ল্যাংড়া আম। অথবা শাহবাগ বেকারির পাউরুটি কিংবা ভিটামিনের মাখন আনার কথা বাড়ি ফেরার সময়। এ ধরনের খুচরো কেনা কাটার অর্ডারে বিরক্ত বোধ করলেও তিনি শেষ পর্যন্ত জিনিসগুলো কিনেই বাড়ি ফিরতেন বিকেলে। কিন্তু আজ ফোনের ওপারে তারই বাড়ি থেকে কে এই নারী বিশৃঙ্খলভাবে হেসে চলেছে? গভীর স্বরে তিনি প্রশ্ন করলেন আবার :

আই বেগু ইয়োর পার্ডন। কে কথা বলছেন আপনি?

তবু কোনো উত্তর নেই সেই হাসির ঢেউ ছাড়া। আবু লতিফ আবার জিজ্ঞেস করলেন :

হুম ডু ইউ ওয়ান্ট প্রিজ?

হঠাৎ হাসি থেমে গেলো। সেই একই স্বরে উত্তর এলো,

খুব হয়েছে। আর ইংরেজি বলতে হবে না। আমি আপনার মালেকা নই। আমি জুলেখা। কুমিল্লার জুলেখা। এবার বুঝেছেন দুলাভাই?

আবার সে হেসে চললো ওদিকে। আবু লতিফ তাড়াতাড়ি মনে করবার চেষ্টা করলেন জুলেখা নামে তার কোনো শ্যালিকা আছে কিনা। কিন্তু বিফল হলেন। হয়তো বা দূর সম্পর্কের কেউ হবে। বেশি আর না ভেবে উত্তর দিলেন :

ও জুলেখা। তুমি। কবে এলে ঢাকায়?

আবু লতিফের কথায় ওদিকে হাসির মাত্রা আরো বেড়ে গেলো। আবু লতিফ কিংকর্তব্যবিমূঢ় শব্দটির প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে লাগলেন ফোনের ধরে। হাসি আবার থামলো।

চিনেছেন আমাকে? জুলেখাকে? জুলেখা কে আপনার বলুন তো?

আবু লতিফ সরাসরি বলতে দ্বিধা করলেন যে জুলেখা তার শালি।

জানতাম চেনেন নি আসলে। ঠিক বলেছি কিনা বলুন তো দুলাভাই?

হ্যাঁ ঠিকই বলেছো।

আবু লতিফ স্বীকার করতে বাধ্য হলেন।

কেন চেনেন নি জানেন?

কেন?

বোকাম মতো আবু লতিফ জিজ্ঞাসা করলেন।

কারণ আমি জুলেখা নই। জুলেখা বলে কেউ নেই আপনার। আমি রাণী। আজ সকালের ফ্লাইটে এসেছি খুলনা থেকে।

এবার আবু লতিফের দেরি হলো না চিনতে। গেল সপ্তাহে মালেকা বলছিলো ওর খালাতো বোন রাণীর ঢাকায় আসার সম্ভাবনার কথা। সেই রাণী তাহলে আজ এসেছে। বছর সাতেক আগে বোধহয় ওকে দেখেছিলেন তিনি। তখন ম্যাট্রিক দিয়েছে কিংবা দেবে। এখন কতো বড়ো এবং কেমন হয়েছে কে জানে। সরকার জিজ্ঞাসা করলেন :

একাই এসেছো নাকি?

বাঃ রে। আমার কি আপনার মতো দোসর আছে যে দোকা আসবো? আপনি সে খবরটুকুও রাখেন না দেখি। কি ভুলে গেছেন নাকি আমাকে দুলাভাই?

আরো না, না। কিন্তু হঠাৎ অফিসে ফোন করলে কেন? তোমার আপা কোথায়?

রান্নাঘরে ভীষণ ব্যস্ত। আমাকে তাই আপনার নাম্বার দিয়ে ফোন করতে বললেন। শাহবাগ বেকারি থেকে -

পাউরুটি আর বিস্কিট কিনে আনার জন্যে তো। বেশ, নিয়ে আসবো বোলো।

আর আমার জন্য কেবু নিয়ে আসবেন, খুলনায় ভালো কেবু মোটেই পাওয়া যায় না।'

হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

ছাড়ি তাহলে।

হ্যাঁ।

ফোন ছেড়ে দিয়ে আবার কাজে মনোনিবেশ করতে সচেষ্ট হলেন আবু লতিফ সরকার। কিন্তু ফিরে ফিরে তার মনে হতে লাগলো রাণীর একটানা হাসি এবং প্রগলভতার কথা। আজকালকার তরুণীরা বোধহয় একটু বেশি স্মার্ট হয়ে গেছে। তার নিজের এক পুত্র এবং এক কন্যা। পুত্র মন্টির বয়স দশ। কন্যাটির বয়স এখন সাত। নাম জীন্নত। ডাকে জীনা বলে। আবু লতিফ ভাবলেন আজ থেকে দশ বছর পরে তার ওই ছোটো মেয়ে জীনা কতোটা স্মার্ট হবে। ভাববে শংকিত হলেন। আশ্চর্য। মানুষ চাঁদে যাচ্ছে। তারপর কোন গ্রহে? আর তারপর? আবু লতিফ হঠাৎ ভাবার চেষ্টা করলেন কোন মূল চিন্তা থেকে তিনি গ্রহে ভ্রমণের চিন্তায় পৌঁছেছেন। ভেবে দেখলেন রাণীর কথোপকথনই এসবের উৎস। কিন্তু কেন তিনি সেই উৎস থেকে চিন্তার স্রোত সৃষ্টি করছেন? কিংবা করতে বাধ্য হচ্ছেন? তার নিজের বয়স তো চল্লিশ পার হয়েছে। চুল পাতলা হয়েছে। পাক ধরেছে। দেহে এবং মুখে চল্লিশ বছরের জীবন যুদ্ধের সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছে। এখন এই প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় তিনি অপরিচিতা এক তরুণী দূরাব্দীয়ার কথা এতটা ভাবছেন কেন? কিন্তু আবু লতিফ বেশিক্ষণ বিশ্লেষণ করবার সময় পেলো না। অফিসের কাজে তিনি হারিয়ে গেলেন।

বিকেলের কিছু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেলো।

বৃষ্টির পরের ঠিক এই মুহূর্তটুকু, আবু লতিফ সরকারের ভালো লাগে। পরিশুদ্ধ বাতাস। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে ভারি আরাম লাগে। আর সেই সঙ্গে ভেজা মাটির গন্ধ। পরিচিত পথ ঘাটকেও তখন নতুন মনে হয় তার।

শাহবাগ বেকারি থেকে পাউরুটি ইত্যাদি নিতে নিতে আবু লতিফ ভাবছিলেন বোধহয় সে

জন্যেই আজ বেকারিতে এসে তার বিরক্তি বোধ হচ্ছে না।

ধানমন্ডিতে তার বাড়ি। শাহবাগের রাউন্ড অ্যাবাইন্ডে বাঁয়ে বড়ো রাস্তাটি ধরে সোজা বাড়ির পথে তার গাড়ি চলে যেতে পারে। অথচ তা না করে প্রায়ই মালেকার অর্ডার অনুযায়ী গাড়িটিকে সোজা পথে নিয়ে বেকারির সামনে দাঁড় করাতে হয়। সেখানে বিকেলে গাড়ি দাঁড় করানোর জায়গা পাওয়াও মাঝে মাঝে মুশকিল হয়ে পড়ে। শাহবাগ জেনারেল স্টোর্সের বাঁধা বিদেশী ক্রেতাদের গাড়ির ভিড় আজো ছিলো।

আবু লতিফের ড্রাইভার গাড়ি তাই একটু দূরে পার্ক করেছিলো। অন্য দিন ওকেই পাঠিয়ে দেন তিনি। কিন্তু আজ আবু লতিফ বেকারিতে নিজেই গেলেন। পছন্দ করে একটি ম্যাডেরা কেব কিনলেন।

গাড়িতে ফিরে আসার সময় এক সাইক্লিস্টের অসতর্ক চালনায় একটু কাদা ছিটকে তার পোশাকে পড়লো। আবু লতিফ ক্রুদ্ধ হয়ে করলেন না সেদিকে। তিনি নিজেকে বোকালেন তার গাড়িও ওরকম অনেক সাইক্লিস্টের গায়ে কাদা ছিটিয়েছে। নিজেকে বেশ ঝরঝরে মনে হতে লাগলো আবু লতিফ সরকারের। গাড়ি বাড়ি অভিমুখে হলো।

রাণী ড্রয়িং রুমে জীনার সঙ্গে স্নেকস অ্যান্ড ল্যাডার খেলছিলো। গাড়ি থেকে নেমেই আবু লতিফ ওর হাসির শব্দ শুনেছিলেন। ওকে প্রথম দেখে বেশ অবাক হলেন তিনি। যৌবন বন্যার বর্ণনা তিনি পড়েছেন এতোদিন কিন্তু এতো কাছে থেকে কোনো দিনও প্রত্যক্ষ করেননি। ওকে দেখে রাণী সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলো।

আশ্চর্য! সেদিনের সেই কিশোরী আজ প্রায় তারই সমান লম্বা। সেদিন যেন সে একটু কালোই ছিলো। অথচ আজ মাংসের প্রাবল্যে রং ফেটে গিয়ে এক স্নিগ্ধ উজ্জ্বলতা এসেছে সারা শরীরে। ফোলা মুখ। ভরা বুক। পুষ্ট হাত। লম্বা চুল।

রাণী খুব কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলো,
কি এখনো চিনতে পারছেন না নাকি? আমিই রাণী। হজুরকে সালাম করতে হবে নাকি?
বলেই সে উবু হয়ে সালাম করতে গেলো আবু লতিফ সরকারকে। আবু লতিফ এক পলকে ওর হাত ধরে ফেললেন।

আহা-হা। করছে কি? আমাকে আবার সালাম করছে কেন?
মুরুব্বি কিনা আপনি! মুরুব্বিদের সালাম করতে হয়।
বলেই সে হেসে উঠলো সশব্দে এবং হাসির স্রোতের হাত ছুটে গেলো আবু লতিফের হাত থেকে। আবু লতিফের মনে হলো তিনি রাণীর হাত হারাতো অনেকক্ষণ ধরেছিলেন। ভেবে তিনি একটু অপ্রস্তুত বোধ করলেন। তাড়াতাড়ি নিজের মেয়েকে প্রশ্ন করলেন :

কিরে বেটি। খেলায় তুই জিতছিস না তোর খালা?
আমি ওর সঙ্গে খেলবো না আবু। ওর ভীষণ ছক্কা পড়ে। একবারো জিতিনি আমি।
ও। তাই বুঝি এতো মুখ তার মেয়ের আমার।
সোফায় বসে তিনি জীনােকে কোলে নিয়ে বললেন :
দ্যাখ দেখি তোর খালাকে আমি কেমন হারিয়ে দিই।
রাণী আবার হেসে উঠলো।

কি ব্যাপার দুলাভাই। এখনো এসব খেলার শখ?

মাঝে মাঝে খেলতে হয় বাচ্চা কাকাদের সঙ্গে। নইলে ওদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না।

আবু লতিফ একটি সারগর্ভ মন্তব্য প্রকাশ করে খেলা শুরু করলেন। খেলার মাঝে একটু একটু করে শুনলেন তিনি।

খুলনার এক উকিল-তনয়া রাণী রাজশাহী থেকে এম.এ. পাশ করেছে সম্প্রতি। এখন উকিলসাহেব যোগ্যপাত্র খুঁজছেন। ঢাকায় এসেছে রাণী কিছুদিনের জন্যে বেড়াতে। ওর কিছু বান্ধবী নাকি আছে এ শহরে। যাদের সঙ্গে কলেজ জীবনে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিলো। এখন খুঁজে পেতে তাদের সঙ্গে ও দেখা করবে।

পরদিন সকালে নানাবিধ কাজে মিঃ সরকার অফিসে ব্যস্ত থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিশেষত তোরাব আলীর জায়গায় অবিলম্বে নতুন লোক নেবার প্রসঙ্গে অনেক সময় কেটে গিয়েছিলো।

সকালের প্রথম ফোন ছিলো হেড ক্যাশিয়ারের।

কি খবর মইজুদ্দিন সাহেব?

জ্বি আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাইছিলাম।

আসুন।

মইজুদ্দিন এসে জানিয়েছিলেন তাজউদ্দিন নামে আর এক দূরসম্পর্কীয় ভাতুপুত্রের কথা।

খুব ভালো ছেলে স্যার। আই.কম. অবধি পড়েছে। তারপর পয়সার অভাবে পড়াশোনাটা আর এগোয়নি। পড়াশোনায় ভালোই ছিলো। নইলে স্যার ওর জন্যে চাকরির কথা বলতাম না। ওকে পড়তেই বলতাম।

হাতজোড় করে কৃপাপ্রার্থী হয়েছিলেন হেড ক্যাশিয়ার সাহেব। কিন্তু ওকে হতাশ করে সরকার বললেন :

না তা হয় না মইজুদ্দিন সাহেব। আমি থাকতে এই কম্পানিতে স্বজনপ্রীতি চলবে না। তাছাড়া আর সবাই বলবে কি, ভেবে দেখেছেন? আপনার ভাতিজার চাকরির জন্যে আপনি তোরাব আলীর চাকরি খেয়েছেন। সে কথা শুনতে কি ভালো লাগবে আপনার?

সে কথা কেউ বলবে না স্যার। তোরাব আলী ইউনিয়নের উকিলও হিসেব দিতে পারছে না। তাই বলছিলাম স্যার ছেলোটিকে একটা চান্স দিতে। ভীষণ সফল ছেলে স্যার। ক্যাশে ওর মতো ছেলেই দরকার। এই চাকরিটা হলে নাইট কলেজে পড়াশোনা করতে পারবে আর তাছাড়া ওর গরিব বাপমাকে একটু সাহায্যও করতে পারবে।

বেশ তো। অন্য কোথাও চেষ্টা করুক না কেন্দ্র।

তাতে কি কিছু হয়? ধরাধরি ছাড়া কোনোখানে কি কোনো চাকরি আর হয় আজকাল?

কিন্তু তবুও এ ব্যাপারে আমি আপনার প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব করতে পারবো না। আপনি যান এখন।

রাত্রিকণ্ঠে মইজুদ্দিনকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এ প্রসঙ্গে সেখানেই শেষ হয়নি। কিছু পরেই পার্সোনেল ম্যানেজার ফোন করে বলেছিলেন :

অ্যাসিস্টেন্ট ক্যাশিয়ারের পোস্টের জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়ে খরচ করে কি লাভ হবে স্যার। বলেন তো আমার জানা শোনা একটা ছেলে নিয়ে আসি।

না, আপনি বিজ্ঞাপন দেবার ব্যবস্থা করুন। অবজার্ভার এবং মনিং নিউজ দুটোতেই বক্স নাম্বারে বিজ্ঞাপন দেবেন।

সারা সকাল আরো কয়েকজনের ক্যাড্ডিডেটকে প্রত্যাখ্যান করে আবু লতিফ সরকার ক্লান্ত বোধ করছিলেন। পড়ন্ত দুপুরের দিকে টেলিফোন বেজে উঠলো।

অপারেটর জানালো বাড়ি থেকে ফোন এসেছে। সরকার এক মুহূর্ত ভাবলেন কে ফোন করেছে।

রাণী?

হ্যালো।

কি করছেন আপনি?

হ্যাঁ রাণীই। ওর স্বর আর ভুল হবার নয়। পা দুটো সামনে মেলে দিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

কি ব্যাপার? তুমি বেড়াতে যাওনি? লাঞ্ছের পরেই তো আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

হ্যাঁ, কিন্তু এঞ্জিনে কি যেন গোলমাল হচ্ছে। কিছুতেই স্টার্ট নিচ্ছে না। ড্রাইভার এখানে টুকটাক কাজ করছে।

তা তুমি ফোন করলে কেন?

আপনিই বলুন না কেন?

তোমার আপা কিছু আনতে বলেছেন।

না। আপা বলেন নি। আমি বলছি। আজ আসার সময় খুব ভালো কয়েকটা আম নিয়ে আসবেন।

বলো, কি আম খাবে?

আপনার যা খুশি।

গোপাল ভোগ, মোহন ভোগ, কিশেণ ভোগ -

ভীষণ লোক তো আপনি? কেবল ভোগ আর ভোগ। ভোগ ছাড়া আর কিছু সঙ্গে আসছে না বুঝি?

না না। ফজলিও আনতে পারি।

না, আপনি ওই ভোগ মার্কা আমগুলোই আনবেন। গাড়ি বোধহয় ঠিক হয়ে গেছে। এখন আসি দুলাভাই।

ফোনটা হঠাৎ যেন ও রেখে দিলো। আবু লতিফ চেম্বার ছেড়ে ওঠে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন। কতো বিচিত্র রকমের লোক নানা গতিতে ছোট্ট যাচ্ছে পথ দিয়ে। তিনি ভাবলেন আরও কতো বিচিত্র রকমের মেয়ে কথা বলে চলেছে কতো স্বরে। যে কথা হয়তো শুধু নিছক কথা। অর্থবিহীন। ইঙ্গিতশূন্য। আবার ফোন বেজে উঠলো। আবার রাণী।

নাঃ। গাড়ি ঠিক হবে না। সে কথা বলতেই ড্রাইভার এসেছিলো।

ও। সে কথা জানানোর জন্যে ফোন করলে আবার?

ঠিক তা নয়। আসলে প্রথমবারও যে আমি ফোন করেছিলাম তা আমার জন্যে নয়।

তবে কিসের জন্যে?

কিছুর জন্যেই নয়। এমনিই। শুধু শুধু কি কথা বলা যায় না?

জানো রাণী তুমি ফোন রেখে দেবার পর আমি ঠিক এ কথাটাই ভাবছিলাম।

কি কথা।

এই কথা। শুধু শুধু অর্থবিহীন কথা বলার কথা। কিন্তু কথার সবই কি অর্থহীন হতে পারে? তার মানে?

তার মানে ধরো এই যে আমার সঙ্গে তুমি কথা বলছো এর মানে কিছু থাকুক বা নাই থাকুক, এই বলাবলিটা কি তোমার ভালো লাগছে না?

ও। কি সৌভাগ্য আমার। আমি ফোন রেখে দেবার পরও আপনি আমার কথা ভাবেন।

রাণী হাসতে থাকলো ফোনের ওপাশে। আবু লতিফ বুঝলেন রাণী ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেলো তার প্রশ্নের উত্তর।

কি ভাবে যেন আরো বারো তেরোটি দিন কেটে গেলো।

আবু লতিফ মাঝে মাঝে ভেবেছেন তার পরিবর্তনের কথা। রাণীর কথা এতো ভাবেন কেন? কি হবে ভেবে? এ কি ভাবা উচিত? কিংবা ভাববেন নাই বা কেন? তিনি তো দোষ কিছু করছেন না। একটু লঘু হাসি। একটু লঘু আলাপ। পরিবর্তে অনেক লঘু মন। লঘু মনের বাসনা করা কি খারাপ? মোটেই নয়। আবু লতিফ তার স্বপক্ষে যুক্তি খুঁজে পেয়েছেন। আশ্বস্ত হয়েছেন।

তাই দুপুরের রাণীর ফোন এলে কথা বলেন। হালকা কথা। এমনি কথা। সন্ধ্যায় নিজে ড্রাইভ করে রাণীকে গুর বান্ধবীদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসেন। সঙ্গে জীনা কিংবা মন্দি থাকে।

একদিন নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত গিয়েছিলেন। আরেকদিন চীনা রেস্টোরাঁয় খেতে গিয়েছিলেন।

রোববার দিন জীনা আর মন্দিকে নিয়ে লুডো খেলেছেন। রাণী জিতেছে। জীনা হেরেছে। কেঁদেছে।

আর সরকার পত্নী মালেকা সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকছেন। শুধু ব্যস্ত থেকেছেন বললে ভুল হবে। দেশ থেকে বোন এসেছে বলে একটু বেশি ব্যস্ত থেকেছেন। রাণীর ভালো খাবার শখ ছোটবেলা থেকেই তা তিনি জানতেন। তাই আজ এটা কাল সেটা রান্না করছিলেন তিনি। ভাড়া তিনি এ-ও আবিষ্কার করেছিলেন যে শহরের আর পাঁচটা পড়ুয়া মেয়ের মতোই রাণীও রান্নাবান্নার কিছুই জানে না। জোর করে তাই ওকে চুলোর কাছে নিয়ে বসিয়েছেন মালেকা। সাধারণ এবং শৌখিন রান্নার মশলা প্রভৃতি পরিমাণ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা প্রসূত প্রশংসা বর্ণনা করেছেন। তাঁর স্বামীর সাম্প্রতিক কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা তা তিনি লক্ষ্য করেনি। লক্ষ্য করার আদৌ কোনো কারণ আছে কিনা তাও ভাবেন নি। সত্যি বলতে কি বিশ্বাস মানে তিনি জানতেন সংসার। সেই সংসারকে তিনি ভালোবাসতেন। ছোটো সংসার সাজিয়েছে। দু'টাকার দৈনিক বাজার আজ দশ টাকায় উঠেছে। একটি চাকর থেকে ঝি-মাস্তি-জমাদার প্রভৃতিতে বেড়েছে।

আবু লতিফের মানসিক অবস্থার খবর নেয়া মানে তিনি জানতেন যে বৈষয়িক অবস্থার খবর নেয়া। সেদিক থেকে কোনো সমস্যার উদ্ভব হয়নি। সুতরাং আবু লতিফের মনের বর্তমান চাক্ষুস্যের কথা তিনি খেয়াল করেননি।

সেদিন বিকেলে চা খেতে খেতে মালেকা কথাটা পাড়লেন।

আচ্ছা রাণী যে এতোদিন হয় এলো, ওকে কি একদিনও জিজ্ঞেস করেছো ও ঢাকা এসেছে কেন? কেন? বেড়াতে।

আবু লতিফ উত্তর দিলেন প্রত্যয়ের সঙ্গে।

এই বুঝি আক্কেল তোমার। ও আসলে চাকরি খুঁজতে এসেছে। বনানীতে ওর বন্ধু লতিফা থাকে। সেইই ওকে চিঠি লিখে আনিয়েছে। ঢাকায় নাকি অনেক চাকরি পাওয়া যায়। তা তুমি ওর জন্যে একটু চেষ্টা করো না কেন?

রাণী শুনছিল। মুখ নিচু করে। আবু লতিফ ওকেই জিজ্ঞেস করলেন, কি রাণী? সত্যি চাকরির জন্যে এসেছো নাকি?

সত্যি না তো কি আমি বানিয়ে বলছি?

মালেকা পান্টা প্রশ্ন করলেন। তারপর বললেন :

শোনো, তোমার সঙ্গে তো সেই ভদ্রলোকের চেনাশোনা আছে।

কোন ভদ্রলোক?

ওই যে যিনি মোটর গাড়ির ব্যবসা করে বড়ো লোক হয়েছেন। এখন একটা গার্লস কলেজ করেছেন। ওকে একটু বলে রাণীর জন্যে ওই কলেজে একটা চাকরি যোগাড় করে দাও না।

আবু লতিফ দেখলেন রাণী মুখ তুলে উদ্বীষ ভাবে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। উত্তরের প্রতীক্ষায় কাতর দুটো চোখ তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করছে। আবু লতিফের সাধ্য ছিলো না সে চোখের প্রার্থনা মঞ্জুর না করার। তিনি বললেন :

বেশ। চেষ্টা করে দেখি কি হয়। তুমি তৈরি হয়ে নাও গে রাণী। সম্বন্ধের পরে পরেই ওর কলেজে ওকে পাওয়া যাবে।

দপ করে মেকালিটসের দুটো ফ্যাশল্যাম্প যেন জ্বলে উঠলো রাণীর দু'চোখে। এক ষটকায় সে উঠে পড়ে বললো :

আপনি কি ভীষণ ভালো দুলাভাই। চাকরি পেলে প্রথম মাসের মাইনে দিয়ে আপনাকে প্রেজেন্ট দেবো। যা চান তাই পাবেন।

বাঃ। আর আমি যে তদ্বিরটা করলাম তার কি পুরস্কার?

মালেকা ঈষৎ হেসে বললেন। রাণী উত্তর দিলো :

তোমার জন্যে বাকি সব ক'মাসের মাইনে আপা।

মনে থাকে যেন।

মালেকা চলে গেলো অন্য ঘরে। রাণীও চলে গেলো ওর ঘরে। ড্রয়িংরুম থেকে একটা লম্বা বারান্দার পরে ওর ঘর।

আবু লতিফ হির দৃষ্টিতে ওর চলে যাবার ভঙ্গিটা লক্ষ্য করলেন পেরছন থেকে। এককালে বিদেশী ছবিতে মেরিলিন মনরোর হাঁটা তাকে আকৃষ্ট করতো। রাণীর হাঁটার ভঙ্গি ঠিক সে রকম না হলেও কোথায় যেন একটা অস্পষ্ট মিল দেখা যায় যখন ওর নিতম্ব অসম তালে ওঠানামা করে কোমর থেকে উরু অবধি! আবু লতিফ ওই হাঁটার দৃশ্যে দুর্বার আকর্ষণ বোধ করেন ওর নিতম্ব হাত রেখে সেই অসম তালের সঠিক লয় নিরূপণের জন্যে। রাণীর নীল শাড়ি অদৃশ্য হলো। আবু লতিফ বাথরুমে গেলেন শেভও স্নানের জন্যে।

নতুন ব্রেড একটা রেজরে পুরলেন সরকার। তারপর নিপুণভাবে শেভ করলেন। শাওয়ারের নিচে নিজেই ছেড়ে রাখলেন কিছুক্ষণ। স্নান শেষে তিনি বহুদিন পর ট্যালকম পাউডার ছড়িয়ে দিলেন সারা শরীরে। সদ্য লব্ধি থেকে ফেরা ট্রাউজার্স শার্ট চাপিয়ে ফিরে এলেন ড্রয়িং রুমে। তিনি

ভাবছিলেন মিঃ আবদুল রহমানের কথা।

ভদ্রলোক গাড়ির ব্যবসা করে প্রচুর পয়সা করেছেন। এখন কিছু টাকা জনহিতকর কাজে খরচ করছেন। কলাবাগান গার্লস কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন আরো কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তির যৌথ প্রচেষ্টায়। গত দাঙ্গা-হাঙ্গামার পরেই এক হিন্দু ব্যবসায়ীর পরিত্যক্ত বাড়িতে কলেজটি স্থাপিত হয়েছিলো। কলেজের পরিচালনার ভার যদিও গভর্নিং বডির কিন্তু সকলেই জানেন যে আবদুল রহমান এর প্রকৃত কর্ণধার। আবু লতিফ সরকার ওকে চিনতেন ব্যবসা প্রসঙ্গে। হঠাৎ তার চিন্তা ভাঙলো রাণীর কলঙ্কে।

কি ব্যাপার? হজুর বসে বসে এতো কি ভাবছেন?

ভাবছি তোমার চাকরির কথা।

আমার চাকরির কথা?

রাণী সশব্দে হেসে উঠলো। তারপর বললো :

আমার চাকরির কথা এতো সিরিয়াসলি না ভাবলেও চলবে। চাকরি আমার একটা হবেই। আজ না হোক কাল। ভালো করে একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখুন তো।

আবু লতিফ বুঝলেন না ভালো করে কিভাবে তাকাতে হয়। তবুও তিনি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। রাণী প্রশ্ন করলো।

বলুন তো কি দেখলেন?

তোমাকে।

সে তো বটেই। কিন্তু বলুন না আমার মধ্যে কি দেখলেন।

অনেক কিছু।

না। আসলটাই দেখতে পাননি। দেখেন আবার ভালো করে। আমার চাকরি হবেই সেটা কি দেখা যাচ্ছে না আমার ভেতর।

হ্যাঁ। স্বীকার করছি। কার সাধ্য তোমাকে ফেরায়।

সত্যিই রাণীকে আজ সন্ধ্যায় আরো কয়েক মাত্রা বেশি ভালো লাগছিলো দেখতে। স্নানের পর ওকে বৃষ্টিধোয়া ফুলের মতো লাগছিলো। মিষ্টি। নরম। পরিষ্কার। একটা শাদা ঢাকাই শাড়ি পড়েছে। সঙ্গে হালকা লাল রংয়ের রাউজ। শাড়ির পাড়ের সঙ্গে সুন্দর মিলে গেছে। লাল দু'ফিতির স্যাভেল পায়ে। সেখানে দশটি ফোলা আঙুল কি সুন্দর সান্নিধ্য দেখে রয়েছে। যদি সে আঙুলগুলো তার উবু হওয়া শরীরে মাড়িয়ে যেতো। আবু লতিফ ওয়ে থাকতে পারতেন মিনিটের পর মিনিট। ঘন্টার পর ঘন্টা।

সত্যি আপনার হলো কি আজ? একেবারে বেখেয়ালি হয়ে পড়েছেন। রাণী অনুযোগ করলো।

না, কিছু হয়নি। চলো। দ্রুতস্বরে আবু লতিফ বললেন।

যাবেন তো। কিন্তু গাল পর্যন্ত পাউডার লেগে রয়েছে। লোকে বলবে কি?

কোথায়? কোন গালে?

বাঁ দিকে।

আবু লতিফ বাঁ গালে রুমাল ঘষলেন। কিন্তু রাণী বললো,

উঁহুঁ। তবু হলো না।

তাহলে তুমিই মুছে দাও না কেন?

বেশ তো দিচ্ছি।

রাণী কাছে এসে ওর হাত দিয়ে সরকারের গাল এবং গলা মুছে দিলো। মুহূর্ত কয়েক মাত্র। কিন্তু কি অপূর্ব মুহূর্ত। এতো কাছে ও ছিলো। সেই প্রথম দিন সালাম করতে উদ্যত হবার পর আজ দ্বিতীয়বার শরীরে শরীরে যোগাযোগ। এতো সখিস্ত সংযুক্তি কি করে এতো কামনার সঞ্চার করে?

গাড়ির কাছেই রোয়াকে জীনা, মন্টি জটলা করছিলো। বাবাদে দেখেই জীনা বায়না ধরে বসলো এক সঙ্গে বেড়াতে যাবার জন্যে।

আবু লতিফ ওকে বোঝালেন যে তিনি যাচ্ছেন বেড়াতে নয়, রাণী খালার চাকরি খুঁজতে এবং বাড়ি ফেরার সময় গরম জিলিপি আনবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওকে নিরস্ত করলেন।

কলাবাগান গার্লস কলেজের বাড়িটিতে কেবল মাত্র একটি ঘরেই আলো জ্বলছিলো। সরকারের অনুমান ব্যর্থ হয়নি। সে ঘরে ঢুকে দেখলেন মিঃ আবদুল রহমান আরো দু'তিনজন জন বৃদ্ধ ব্যক্তির সংগে বসে কলেজের কর্মপন্থা ইত্যাদি আলোচনা করছেন। আবদুল রহমান সশব্দ হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

আসুন। আসুন। বহুদিন পরে আপনার দর্শন পেলাম সরকার সাহেব। পাকা ব্যবসায়ী আবদুল রহমান। কথাবার্তার ধরনও সে রকম হয়ে গেছে।

এই এলাম আপনার এখানে। বহুদিন আপনারও তো কোনো খোঁজখবর নেই। কলেজ কেমন চলছে।

চলছে ভালোই। ছাত্রী সংখ্যা তো বেড়েছে, জানেন অনেক। তবে ওই প্রিন্সিপাল নিয়ে সমস্যা। কি সমস্যা আবার?

সমস্যা এই যে ওরা থাকেন না। এখানে কিছুদিন চাকরির পরেই ভালো চাপ পেয়ে হয় বিদেশ নয় ইউনিভার্সিটি নয়তো বা গভর্নমেন্ট কলেজে। আর আজকাল কেউ কাজ করে না। সবাই এসে টাকা খোঁজে। বলে এতো দিলে থাকবো নইলে চললাম। কিন্তু ওরা জানে না প্রিন্সিপাল মে কাম অ্যান্ড প্রিন্সিপাল মে গো, বাট মাই কলেজ উইল রিমেইন ফরএভার! সে যাই হোক। বলুন সরকার সাহেব আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি।

রাণীকে পরিচয় করিয়ে দিলেন আবু লতিফ এবং আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। আবদুল রহমান সব শুনে এমন ভাব প্রকাশ করলেন যে তিনি ঠিক ঠিকভাবে অপেক্ষা করছিলেন। ড্রয়ার থেকে একটি শাদা কাগজ বের করে রাণীকে দিয়ে বললেন তখুনি একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখে ফেলতে। কি ভাষায় ওটা লিখতে হবে তাও তিনি বলে দিলেন। তারপর তিনি আবু লতিফকে বললেন :

কিছু চিন্তা করবেন না। আপনার শালির চাকরি কালই হয়ে যাবে। আরে আপনার ওখানেই যে আমার কলেজের টিচার আছে তা কে জানতো? তবে আপনি আসায় ভালোই হয়েছে। দু'তিন দিন হয় আপনার অফিসে যাবো যাবো করছিলাম। সময় করে উঠতে পারলাম না।

কেন? কোনো দরকার ছিলো কি আপনার?

না ঠিক আমার নয়। আমার জানাশোনা একটি ছেলে অনেক দিন ধরে একটা চাকরি খুঁজছে। বড়ো ভালো ছেলে। লেখাপড়া করার খুব শখ। কিন্তু আই. কমের পর আর পড়তে পারেনি। পয়সার অভাবে। গরিব বাপ-মা। ওর এক আত্মীয় আপনাদের কম্পানিতে কাজ করে।

কি নাম বলুন তো।

মইজুদ্দিন। হেড ক্যাশিয়ার। ওরি কাছে শুনলাম আপনাদের অফিসে অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যাশিয়ারের পোস্ট-টা নাকি ভেকেন্ট আছে।

আবু লতিফ সরকার কয়েকটি বিরাট ধাক্কা খেলেন। তিনি আবদুল রহমানকে চিনতেন। তাই জানতেন যে রাণীর চাকরি হলে একটা দাম একদিন না একদিন দিতে হবে। কিন্তু দাম যে নগদ দিতে হবে ঠিক একথা ভাবেন নি। কি আশ্চর্যভাবে বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে আবদুল রহমান তার প্রস্তাব পেশ করলো। সে কি একবারো ভেবেছে হেড ক্যাশিয়ারের সেই আত্মীয়টি সত্যিই পদটির যোগ্য কি না। আবু লতিফ মনে মনে হাত কামড়ালেন। রাণীর জন্যে আজকে না এলে কি ভালোটাই না হতো। আবদুল রহমানকে তার কাছে আসতে হতো তখন এবং তিনি তার দাম হাঁকতে পারতেন। তার মনে পড়লো হেড ক্যাশিয়ার মইজুদ্দিনকে কিভাবে তিনি সেদিন সকালে ঘর থেকে বিদায় করেছিলেন। কিন্তু আজ? আজ তাকে বিদায় করবেন কি করে?

রাণীর ততোক্ষণে অ্যাপ্রিকেশন লেখা শেষ হয়ে গেছে। হাত বাড়িয়ে সেটি ওর কাছ থেকে নিতে নিতে আবদুল রহমান বললেন :

ছেলেটির নাম বোধ হয় তাজউদ্দিন। আপনি যদি বলেন তাহলে ওকে কালই পাঠিয়ে দিতে পারি আপনার অফিসে।

একটু নড়ে চড়ে কাষ্ট হাসি হেসে আবু লতিফ উত্তর দিলেন,

নিশ্চয়ই! কাল দশটা নাগাদ ওকে আমাদের পার্সোনেল ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে বলবেন আমার নাম করে।

অনেক ধন্যবাদ সরকার সাহেব। আমি জানতাম আপনি আমাকে হতাশ করবেন না। কালই ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি। একটু আনখার্ট হতে পারে। ইংরেজি টিংরেজি বুঝতে নাও পারে। আপনি একটু কাইভলি ম্যানেজ করে নেবেন। আর হ্যাঁ, মিস হকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট স্টেটারটা আগামী কালই বিকেলের মধ্যে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবো। এখন দিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু সবাই মিলে কলেজটা করছি তো। তাই গভর্নিং বডি-র একটা পারমিশন নিয়ে রান্নাটা সম্ভব হবে। মিসার ফর্মালিটি। কালকে ওদের মিটিং আছে। সেখানেই পাশ করিয়ে নেবো। কিছু চিন্তা করবেন না।

আবদুল রহমান আশ্বাস দিলেন। মিস হক অর্থাৎ রাণী যেন হাঁক ছেড়ে বাঁচলো। আবু লতিফ কিন্তু ভারি বোধ করছিলেন। কিন্তু সে তার মুক্ত হবার কোনো উদ্দেশ্য আর ছিলো না। আবদুল রহমান যথেষ্ট খাতির যত্ন করলেন।

পিওন পাঠিয়ে চা-সিগাড়া আনালেন আর সেখানে বসতে বললেন :

বড়ো দুখ লাগে সরকার সাহেব চা-সিগাড়া দিন ফুরিয়ে এলো বলে। আজকাল যেখানেই যাই সেখানেই কোক-ফান্টা আর সেভেন-আপ খাই। পেট ভর্তি একগাদা গ্যাস নিয়ে ফিরি। আমার এখানে এলে ওসব কিছু পাবেন না কিন্তু।

আবু লতিফ এক নোত্রা কাপে চা এবং একটি সিগাড়ার দাম এক বোতল কোকের সঙ্গে তুলনা করলেন মনে মনে। ভাবলেন চিনির ব্যবসায়ের গেলে আবদুল রহমান বোধহয় প্রতিটি কণারও হিসেব করতো। তিনি চা খেয়েই উঠে পড়তে চাইলেন। কিন্তু আবদুল রহমান ওদের আরো কিছুক্ষণ ধরে রাখলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রাণীর কথা জিজ্ঞেস করে জেনে নিলেন। রাণী আর আবু লতিফ সরকার যখন আবদুল রহমানের ঘর থেকে বেরুলো তখন সন্ধ্যা আটারও বেশি।

কলেজের বিলডিং থেকে একটু দূরে সরকারের টয়োটা পার্ক করা ছিলো। ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে আবু লতিফ বলছিলেন :

লোকটা ব্যবসা ছাড়া আর কিছু জানে না বুঝলে রাণী। এই যে কলেজ দেখছো। এর মূলেও সেই ব্যবসা। গভর্নিং বডির কোনো তোয়াক্কাই সে করে না। এতো ছাত্রীদের যে বেতন পায় তার হিসেব এখন পর্যন্ত দেয়নি। অথচ টিচারদের বেতন দেবার বেলায় ওর হাত কিছুতেই উঠতে চায় না। কে থাকবে এই কলেজে। কিছুদিন পড়াও এখানে। তারপর দেখি কোথাও তোমাকে -

উঃ মাগো। হঠাৎ রানী লাফ দিয়ে উঠে চিৎকার করে বললো :

কি হলো? সশবাস্ত হয়ে আবু লতিফ জিজ্ঞাসা করলেন।

নরম কি যেন একটা হেঁটে গেলো পায়ের ওপর দিয়ে।

তাই নাকি। সাপটা প নয়তো? তাড়াতাড়ি এসো তো আলোটোর নিচে।

কাছের লাইট পোস্টটির নিচে গিয়ে রাণী দাঁড়ালো।

দেখি। দেখি। শাড়িটা একটু উঁচু করে ধরো। আবু লতিফ ওর পায়ের কাছে বসে পড়ে বললেন :

রাণী অতি ধীরে ওর শাড়ি একটু উঁচু করলো। আবু লতিফ সূতীক্ষ্ণভাবে দেখলেন। না কোনো দাগ নেই। একটি পায়ের পাতার ওপর হাত দিয়ে বললেন :

কোনো কামড় খাণ্ডনি তো।

না।

তাহলে ব্যাংটাং হবে হয়তো।

আবু লতিফ বললেন ওর পা থেকে চোখ না ফিরিয়ে। সেই সারি বাঁধা দশটি ফোলা আঙ্গুল। দশটি লাল পলিশ দেয়া নোখ। দশটি মোহময়ী নতকী পায়ের স্ট্রজের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে যেন অভিবাদন জানাচ্ছে। নাকি আমন্ত্রণ? নাচে যোগ দেবার? এখুনি ওরা নড়ে উঠবে? কথা বলবে? পায়ের কজার ওপরে দু'চারটের ছোটো লোম ইতস্তত ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা কি যোগ দেবে? তারপর হাঁটু, উরু, শরীর। কোথায় এ নিমন্ত্রণের শেষ?

ছিঃ। লোকে কি ভাববে। গাড়িতে চলুন।

রাণী আস্তে আস্তে বললো। শাড়িটা ছেড়ে দিলো। পাড় এসে পড়লো আবু লতিফের হাতের ওপর। আবু লতিফ উঠে দাঁড়ালেন। কোনো কথা বললেন না। জ্বরপদে গাড়ির দিকে এগোলেন। আকাশে চাঁদের আলো জোরালো ছিলো না। তেমন বেগি হাওয়াও ছিলো না। আবু লতিফ কোনো দিনও মদ খাননি। কিন্তু মদের পার্টিতে গিয়েছেন। মাতাল দেখেছেন। অবাক হয়েছেন ওদের অসংলগ্ন কথা শুনে। চলা দেখে। এখন অবাক হচ্ছিলেন নিজের কথা ভেবে। যুক্তি, তর্ক, বিচার, বুদ্ধি, বিবেচনা সব কিছুই কি তিনি হারিয়ে ফেলছেন নাকি?

সেই মাতালগুলোর মতো নিজেকে কি তিনি ঘটনার হাতে ছেড়ে দিতে চাইছেন নাকি?

ড্রাইভিং সিটে বসে তিনি বাঁ হাত দিয়ে সামনের দরজাটি খুলে দিয়ে ডাকলেন :

এসো।

রাণী বসলো। দরজাটি বন্ধ করে দিলো আস্তে। আবু লতিফ চাবি ঘোরালেন। ইগনিশনের আলোর একটি লাল ফুটকি জ্বলে উঠলো ড্যাশ বোর্ডে। সেই নোখের মতো লাল রং। চাবি আরেকটু ঘোরালেন তিনি। গাড়ির এঞ্জিন চলা শুরু করলো। থরথর করে গাড়িটা কাঁপতে লাগলো। ধীরে

তিনি ক্লাচ এবং হ্যান্ডব্রেক রিলিজ করলেন। ধীরে গাড়ি চলতে শুরু করলো।

মীরপুর রোডে এসে গাড়ি চলে গেলো সেকেন্ড ক্যাপিটালের বড়ো রাস্তায়। ফার্মগেট।
এয়ারপোর্ট। বনানীর পথে। বেশ কিছুক্ষণ দুজনাই চুপ করেছিলো। তারপর আবু লতিফই
বললেন :

তোমার গরম লাগছে নাকি?

একটু।

জানালা পুরোটা খুলে দিয়েছো?

হ্যাঁ।

ও। কোয়টার উইন্ডোটা খোলানি দেখছি। ওটা খুলে দাও। আরো হাওয়া আসবে।
দিচ্ছি।

রাণীর স্ট্যাকক্যাটো উত্তর আবু লতিফ একটু ভাবিত হলেন। বাড়ি ফেরার পথে যান নি বলে
রাগ করেনি তো? কিন্তু তাহলে সে তো বলতোই ফিরতে।

জানো? তোমার ওই সিটটাকে কি বলে? একটু হালকা করার জন্যে তিনি বললেন :
তার মানে?

এই যেমন আমার সিটটাকে বলে ড্রাইভিং সিট। পেছনেরগুলোকে বলে ব্যাক সিট। আর
তোমারটাকে?

কেন? ফ্রন্টসিট?

হ্যাঁ। তা ঠিক। তবে ও সিটের আরেকটা নাম আছে। সুইসাইড সিট।

সুইসাইড সিট? ভারি আশ্চর্য তো। কিন্তু সুইসাইড সিট নাম কেন হলো?

কেননা সব মোটর অ্যাকসিডেন্ট হিসেব করে দেখা গেছে সব চেয়ে বেশি মারা গেছে ওই
সিটেরই যাত্রী।

অথচ এই সিটেই আমার বসতে সবচেয়ে ভালো লাগে তা জানেন?

জানলাম।

তাই বলে মরবার শখ আমার বিলুপ্ত নেই। গাড়ি সাবধানে চালাবেন কিন্তু বলে দিলাম।

গাড়ি যে তখন কোন পথে চলছিলো আবু লতিফ বলতে পারেন না। নির্জন রাস্তা! অল্প স্পিডে
চলছিলো গাড়ি বাঁ পাশ ঘেঁষে। ডান দিক দিয়ে মাঝে মাঝে অন্য গাড়িগুলো ওভারটেক করে যাচ্ছে।
আবু লতিফ আত্মগতভাবে বললেন :

জানো রাণী? নিজেই কার মতো মনে হচ্ছে?

কার মতো আবার?

পৃথিরাজের মতো।

পৃথিরাজ?

হ্যাঁ, পৃথিরাজ। সে গল্প তোমরা হয়তো পড়েনি। তাই জানো না। আমাদের কালে সে ইতিহাস
পড়তে হতো। রাজকুমারী সংযুক্তার বাবা তাঁর মেয়েকে পৃথিরাজের হাতে দিতে চান নি। কিন্তু
পৃথিরাজ বিরাট যোদ্ধা। তিনি এসে জয় করে সংযুক্তাকে নিয়ে পালালেন। তখনকার ইতিহাস
বইতে সেই নিয়ে পালালো ছবিটা আমাকে মুগ্ধ করতো। বিরাট এক ছুঁতন্ত ঘোড়ার পিঠে পৃথিরাজ।
একহাতে তার বাঁকানো লম্বা তলোয়ার। আরেক হাতে সংযুক্তাকে চেপে ধরে আছেন। কিন্তু

পুথিরাজ মুসলমান ছিলেন না। তাই তার ইতিহাস তোমাদের বই থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। কিন্তু আমার মনে সেই ছবিটা ভীষণ দাগ কেটে গেছে।

তাই বুঝি? কিন্তু নিজেকে কেন পুথিরাজ মনে হচ্ছে তা বললেন না।

ঠিক মনে হচ্ছে বললে হয়তো বা ভুল বলা হবে। মনে হচ্ছে যদি ওর মতো হতে পারতাম। ঘোড়া আমার নেই। কিন্তু গাড়ি আছে। এক হাতে আছে স্টিয়ারিং হুইল। আর অন্য হাতে তোমাকে নিয়ে যদি কোথাও পালিয়ে যেতে পারতাম।

রাণী চুপ করে থাকলো। পথচারীশূন্য এ পথ কোথায়? কুর্মিটোলা? টঙ্গি? বনানী? গুলশান? আবু লতিফও চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন :

অনেকক্ষণ ধরে মাঝে মাঝে একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি। তোমার দরজাটা ঠিক করে বন্ধ করোনি হয়তো।

রাণী দরজাটা খুলে আবার বন্ধ করতে যাচ্ছিলো। আবু লতিফ বললেন, উহ। চলন্ত গাড়িতে কখনোই এ কাজটি করো না।

গাড়ি তার থেমে গেলো রাস্তার পাশে ঘাসের ওপর। আবু লতিফ নিজেই রাণীরে কোলের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দরজাটা খুলে আবার বন্ধ করলেন জোরে। তারপর ধীরে তিনি হাত ফিরিয়ে আনছিলেন। কিন্তু ফিরিয়ে আনতে পারলেন না।

রাণীর একটি হাত এসে পড়লো তার হাতের ওপর। আবু লতিফ অপর হাত দিয়ে এঞ্জিন এবং লাইট অফ করে দিলেন।

হ হ করে তখন বাতাস আসছে। রাস্তার পাশে গাছগুলো বাতাসে মুখরিত হয়ে উঠছে। পাতা আর ডালগুলো অশান্ত হয়ে পড়ছে। রাণী ওর দু হাতের মূঠোয় আবু লতিফের বাঁ হাত ধরে রয়েছে। হঠাৎ চাপ দিচ্ছে। আবু লতিফ তার অন্য হাতও এনে রাখলেন রাণীর কোলে। সিটের পেছনে রাণী তখন মাথা মেলে দিয়েছে। দুচোখ তার বন্ধ। কয়েক গোছা চুল মুখের এধারে ওধারে বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে। আবু লতিফ ওর দিকে একটু কাৎ হয়ে কোমর জড়িয়ে ধরলেন। উষ্ণ মসৃণ সে কোমর তার মনে কামনার তারা বাতি ছেঁলে দিলো। তিনি ওকে আরো কাছে টেনে নিলেন। অসাড়ভাবে রাণী ওর কাছে যেন গড়িয়ে এলো। বাতাসে তার চুল আবু লতিফের ঠোঁটে এসে লেগে গেলো। আলগোছে সে চুল সরিয়ে দিয়ে তিনি রাণীর মুখটিকে কাছে নিয়ে এলেন। ওর ঠোঁট দুটো যেন কেঁপে উঠলো। আবু লতিফ সজোরে চুমুতে সে কাঁপুনি সৃষ্টি করে দিলেন। রাণীর ঠোঁট দুটো ধীরে খুলে গেলো। ওর ঝকঝকে দাঁত আর লাল জিহ্বা আবু লতিফের সহস্র আকাঙ্ক্ষাকে অপ্রতিরোধ্যভাবে সচেতন করে তুললো। আবু লতিফ কখন যেন ওর বুকের বসন শিথিল করে ফেলেছেন। তিনি তার মুখ গুজে দিলেন ওর সুগঠিত দু'স্তনের মাঝে। দুহাতে চেপে ধরলেন দু'স্তন দিয়ে নিজের মুখকে। প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন। মরণদেশে তৃষ্ণার্ত এক ক্লান্ত পথিক যেন হঠাৎ সরোবরের সন্ধান পেয়েছে। তিনি ওর বুকে পিঠে কোমরে অঙ্গস চুমু খেয়ে যেতে লাগলেন। কখনো স্বল্পক্ষণ। কখনো দীর্ঘক্ষণ। রাণী ওর চুলে আর ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো। আবু লতিফ আবার তার মুখ তুলে আনলেন। রাণীর চোখ তখন আধো খোলা। ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক করা। শাদা দাঁতগুলো একটু করে দেখা যাচ্ছে। আবু লতিফ ওর দু'গালে দু'হাত রেখে মুখখানি আরো কাছে নিয়ে এলেন। হঠাৎ রাণীর ঠোঁট পুরো খুলে গেলো। ওর লাল জিহ্বা লকলক করে বেরিয়ে এসে আবু লতিফের মুখ টেনে নিলো। অস্ফুট স্বরে তিনি বলতে লাগলেন :

রাণী! রাণী! রাণী!

রাণী কোনো কথা বলছিলো না। আবু লতিফ পাহাড়ের চূড়ার শেষে যেন এসে পৌঁছেছেন।
তিনি চাপা স্বরে বললেন :

এসো। গাড়ির বাইরে এসো।

না।

তবে পেছনের সিটে এসো।

না।

না?

হ্যাঁ। না।

কেন? তুমি কি চাও না?

আজ না। আজ থাক?

কেন?

আজ অনেক পেয়েছি। আমি তো তোমারই। যখন খুশি নিতে পারো। কিন্তু আজ না।

কেন? কেন লক্ষ্মীটি?

বোঝো না কেন? সব কথা কি মেয়েরা বলতে পারে?

ও।

‘কি হোলো?

না কিছু না।

প্রিজ। একটু বোঝো।

বুঝেছি। কিন্তু বলো কাল আসবে!

কাল নয় শুধু। পরশু। তরশু। যেদিনই তুমি ডাকবে সেদিনই আমি আসবো।

রাণীর মুখে তুমি শোনার সাধ তার মিটেতে চাইছিলো না। একি আরেক নতুন মিষ্ট অনুভূতি।

তিনি ওর উরুতে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, রাণী। তুমি কথা বলো। আমি শুনি।

না। এখন চলো। অনেক রাত হয়ে গেছে। আপা নিশ্চয়ই চিন্তিত করছে।

হঠাৎ যেন তিনি তার চেতনা ফিরে পেলেন। হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন রাত প্রায় দশটা। ধীরে তিনি রাণীকে বিযুক্ত করলেন। গাড়ি স্টার্ট দিলেন।

আকাশে তখন দলা দলা হালকা মেঘ লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। চাঁদের সঙ্গে ওরা যেন কুমীর কুমীর খেলছে। কতোগুলো তারা ওদের দেখছে। আবু লতিফও দেখলেন। ওই মেঘের মতোই নিজকে তার চপল বোধ হচ্ছিলো। খুশি লাগছিলো।

বাড়িতে মালেকা জেগে বসে বসে সচিত্র সন্ধানী পড়ছিলেন। অনুযোগ করলেন দেরি হয়ে গিয়েছে বলে। আবু লতিফ দোষ দিলেন রাণীর এক কল্পিত বান্ধবীর আতিথেয়তার ওপর।

ফেরার পথে রাণীর জন্যে যেতেই হলো ওখানে।

লতিফার ওখানে?

না গুলশানে জোহরার ওখানে।

জীনা এতক্ষণ বসে থাকলো জিলিপির জন্যে। শেষ পর্যন্ত না খেয়েই ঘুমিয়ে গেলো।

শালামারে আজ জিলিপিই তৈরি হয়নি। কাল নিয়ে যাবো কোথাও ওকে।

মালেকা খাবার টেবলে চলে গেলেন।

আবু লতিফ ভাবলেন কেন তাকে মিথ্যে কথা বলতে হলো। তিনি যে ভালোবেসেছেন সেটা অন্যায়? যা এখন তিনি সত্যি বলে জানেন, দেহ এবং মন দুই দিয়েই অনুভব করেন, তাকে তিনি প্রকাশ করার সাহস পাচ্ছেন না কেন?

নাকি এই গোপন রাখাটাই সামাজিকতা। সভ্যতা। তিনি সঠিক উত্তর খুঁজে পেলেন না।

পরদিন সকালে অফিসের সামনে জেনারেল ম্যানেজারের টয়োটা ইম্পিরিয়াল দেখে আবু লতিফ সরকার জানলেন আজ মিঃ গায়েন অফিসে এসেছেন। লিফটম্যান জানালো কিছুক্ষণ হয় পাওয়ার ফেল করেছে। লিফট চলছে না। সরকার সিঁড়ি ভেঙে ওপরে গিয়ে নিজের ঘরে বসলেন। আজ কতো তারিখ? কি বার? দেয়ালের রঙিন ক্যালেন্ডারটির দিকে তিনি কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। এতোগুলো দিন দ্রুত পার হয়ে গেছে? আশ্চর্য! এমনও হয়?

পেন্ডিং ট্রের দিকে তিনি তাকালেন। না। কোনো কাজ বাকি নেই। বরং অনেক কাজ এগিয়ে আছে। হারানো বয়েসই শুধু তিনি ফিরে পাননি; সেই সঙ্গে ফিরে পেয়েছেন অতীতের কর্মক্ষমতা। অদ্ভুত উদ্যমে কাজ করেছেন এই ক’দিন।

ভারি কৃতজ্ঞ বোধ করলেন তিনি রাণীর প্রতি। তারি জন্যে তো এই পুনর্জন্ম লাভ। এই সৌভাগ্য। অশেষ উদ্যম। কি করে তিনি ওর এই ঋণ শোধ করবেন? আজ সন্ধ্যায় সে কথাটাই সবচেয়ে প্রথমে জিজ্ঞাসা করবেন এই সিদ্ধান্ত নিলেন আবু লতিফ।

টেলিফোন বেজে উঠলো। মিঃ গায়েন ডেকে পাঠালেন।

ছাই রঙা পাতলা একটা সামার সুট পরে রিভলভিং চেয়ারে বসে দু’চারটে চিঠি দেখছিলেন মিঃ গায়েন। আর মাঝে মাঝে বিদেশী সিগার ফুঁকছিলেন। বয়েস তার পঞ্চান্ন থেকে ষাট। কিন্তু চোখে মুখে কোথাও কর্মময় দীর্ঘ জীবনের ক্লান্তির ছাপ নেই। লম্বা গড়ন। বাহ্যিকভাবে এমন চেহারা সাধারণত দেখা যায় না। তাই কেউ আশ্চর্য হন না জেনে যে তিনি এতো বড়ো একটি আন্তর্জাতিক কম্পানিতে এতো উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত আছেন। সরকারকে দেখে তিনি দাঁড়িয়ে সজোরে কর্মমর্দন করলেন। স্থিত হাসি হেসে বললেন :

তারপর? সব খবর ভালো তো?

হ্যাঁ।

হ্যাঁ! আমিও জানি। ডুসেলডর্ফ থেকে তোমার ওপর একটা নোট এসেছে।

আমার ওপর?

হ্যাঁ। তোমার এবং আমার ওপর। সাউথ ইস্ট এশিয়ার হেড কোয়ার্টার্স ওরা ব্যাংককে করতে চাইছে। আজকাল মালয়েশিয়াতে বেশ গোলমাল চলছে জানানো নিশ্চয়ই। তাছাড়া ভিয়েতনাম সমস্যারও বোধহয় একটা সমাধান শিগগিরই হবে। এসব ঘটনার সঙ্গে আমি ঢাকা থেকে তাল রাখতে পারছি না। ঢাকা বড়ো আইসোলেটেড। আমি তাই ব্যাংকক থেকেই কাজ চালাবো ভাবছি। তাই জিইপি জানতে চেয়েছে তোমার হাতে ঢাকার ভার ছেড়ে দেয়া যায় কিনা। অর্থাৎ তোমাকে এখানের জেনারেল ম্যানেজার করা যায় কিনা। আমার মতামত তুমি তো জানোই। এবার বলো তোমার কি মত?

হঠাৎ ঘরের বাতি জ্বলে উঠলো এবং এয়ারকন্ডিশনারটা চলতে শুরু করলো। আবু লতিফ সরকার এই সৌভাগ্যে অবাক হচ্ছিলেন। এটা অতাবিত ছিলো না। একদিন হয়তো তিনি জেনারেল ম্যানেজার হতেন। কিন্তু এটা খুবই আকস্মিক ছিলো। এতো তাড়াতাড়ি তিনি উন্নতির শেষ ধাপে পৌঁছতে পারবেন, সে আশা তিনি কখনো করেননি। আশ্চর্যে আশ্চর্য তিনি উত্তর দিলেন :

আপনি যা ভালো মনে করেন তাই করুন। আমি তো সব সময় আপনার কথা মতোই চলেছি। বেশ। তাহলে হোম অফিসে জানিয়ে দিচ্ছি আগামী সেপ্টেম্বর থেকে ফর্মালি তোমাকে চার্জ দিয়ে দেবার কথা।

ধন্যবাদ জানিয়ে সরকার চলে আসছিলেন। কিন্তু মিঃ গায়নের ডাকে ফিরে দাঁড়ালেন। মিঃ গায়ন একটা ছোটো চিরকুট তুলে বললেন, আর শোনো সরকার। এই কাগজে একটি ফোন নাম্বার আর ঠিকানা আছে। ফোনে তুমি আফসার আলী গায়ন বলে একটি ছেলেকে পাবে। ছেলেটি আমার আত্মীয়। কিন্তু এতো বখাটে যে আত্মীয় বলতে লজ্জা হয়। তোমার কাছে তো সব বলা যায়। ছেলেটিকে তুমি তোমার ডিপার্টমেন্টে নিয়ে এসো কিছুদিনের জন্যে। তোমার ওখানে শুনলাম অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যাশিয়ারের পোস্ট খালি হয়েছে। আমি জানি ওকে ওখানে বেশি দিন রাখা যাবে না। মাস দু'তিনেক পরে সেগসে ট্রান্সফার করে দিয়ে। ওখানে একটা পোস্ট ততোদিনে ফ্রিয়েট করা যাবে।

মিঃ গায়ন ঠান্ডাভাবে কোমল স্বরে কথাগুলো বলে গেলেন। কিন্তু তার কথাগুলো তীক্ষ্ণ ছুরির মতো মনে হলো সরকারের। সেই ছুরিগুলো তাকে যেন দেয়ালের সঙ্গে গঁথে ফেললো। মিঃ গায়ন ওর বিবর্ণ মুখ দেখে বললেন, 'কি হলো তোমার সরকার? শরীর খারাপ লাগছে নাকি?

না, না। কিছু না,

কিছু না আবার কি? নিশ্চয়ই কিছু। ভালো করে মেডিকাল চেক আপ করিয়ে নিয়ে।

সিগারের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে মিঃ গায়ন একটি আন্তরিক উপদেশ দিলেন। সরকার ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এলেন নিজের ঘরে। সেখানে এসে পার্সোনেল ম্যানেজারকে ফোন করে জানালেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যাশিয়ার নেয়া হয়ে গেছে। ও পোস্ট আর খালি নেই। কোম্পানি ক্যাভিডেট এলে যেন তাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়।

সেদিন বিকেলে তিনি বাড়ি ফিরে এসে রাণীকে দেখতে পেলেন না। অবচেতন মনে এরকম একটা শংকা দুপুর থেকেই ঘুরছিলো। কারণ রাণীর কোনো ফোন তিনি পাননি। সেই সকাল হতে পরাজিতের মনোভাব নিয়ে তিনি কাজ করছিলেন।

মালেকা দু'টি খবর দিলেন। প্রথমটি তিনি আশা করছিলেন। দ্বিতীয়টি নয়। দুপুরের দিকে আবদুল রহমানের ফোন এসেছিলো। মালেকাই ধরেছিলেন। ফোনে আবদুল রহমান খুবই দুঃখ প্রকাশ করে জানিয়েছিলেন যে বর্তমানে তার কলেজে রাণীর চাকরি হবে না। কিছুদিন পর আবার অ্যাপ্রাই করতে বলেছেন।

আর দ্বিতীয় খবর হলো তারপর রাণীই ফোন করেছিলো কেন তার চাকরি হবে না। আবদুল রহমান তখন ওকে কলেজে দেখা করতে বলেছেন খোলাখুলি ভাবে কথা বলার জন্যে। রাণী সেখানেই গেছে এখন। কলাবাগান গার্লস কলেজে। আরো বলে গেছে ফেরার পথে গুলশানে

জোহরার বাড়ি হয়ে আসতে পারে। দেরি হলে চিন্তা না করার জন্যে।

সেদিন রাতে সেই লম্বা বারান্দায় আবু লতিফ সরকার বসে বসে আকাশ দেখছিলেন। মাঝে মাঝে বরফ মেশানো ঠান্ডা কোকাকোলার গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিলেন। কতো রাত হবে কে জানে। রাণী তখনো ফেরেনি।

আবু লতিফ ভাবছিলেন অ্যাপোলো রকেট কি এখন চাঁদের দিকে সঠিক পথে চলেছে? যদি সেই রকেট দিগভ্রান্ত হয়ে যায়? তাহলে সেই অ্যাস্ট্রোনটগুলো কোন দিক থেকে কোন দিকে যাবে? কবে ওদের অক্সিজেন শেষ হয়ে যাবে? কবে তারা ধ্বংস হবে?

আবু লতিফ সরকার নিজেকে সেই কম্পিত কক্ষচ্যুত মহাশূন্যচারীদের সহযাত্রী বোধ করছিলেন।

এখন আর কোনো মিলন নেই।

লক্ষ্য নেই।

শুধু প্রতীক্ষা আর প্রতীক্ষা।

জরার।

জীর্ণতার।

অন্তিম যুহুর্তের।

গত বছরের শেষের দিকে ঢাকার একটি দৈনিক পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় যে চাঞ্চল্যকর সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিলো তার সারাংশ নিচে উদ্ধৃত হলো।

আবুল খায়ের নামে একটি দশ বছরের ছেলে আটশ দিন নিখোঁজ থাকার পর আজিমপুর কলোনীতে তার মা-বাবার কাছে ফিরে এসেছে। এক দুর্দান্ত ছেলে ধরার দল তাকে ধরে নিয়ে বন্দী করে রেখেছিলো এবং সে ভাগ্যবলে মুক্তি পেয়েছে।

অতীতের সুস্থ ছেলেটিকে এখন চলা ফেরায় সাহায্য করতে হয়। কারণ ছেলে ধরার দল তাকে ভিক্ষুক বানানোর জন্যে পা মুচড়ে দিয়েছিলো। ছেলেটি একদিন বিকেল পাঁচটায় বাড়ি হতে বেরিয়ে কাছের এক দোকানে চা কিনতে আসে। ফেরার পথে একটি গাড়ি হতে তাকে কে যেন ডাকে। গাড়ির কাছে যেতেই আরোহী তাকে বলপূর্বক গাড়িতে তুলে নেয় এবং গাড়িটি সজোরে চলতে তাকে। গাড়িতে অন্য আরোহী ছিলো গাড়ির চালক। ছেলেটি চেষ্টানোর চেষ্টা করলে তার মুখ চেপে রাখা হয়।

ছেলেটি একটু পরেই খেয়াল করে যে অন্য আরেকটি গাড়ি নিউ মার্কেট হতে তাদের গাড়ির পিছু আসছে। তার কিছু পরেই গাড়ি দুটি যশোরের দিকে চলতে থাকে। অন্য গাড়িতে আরো দুটি ধৃত ছেলে ছিলো। পরদিন সকালে গাড়ি দুটি যশোরের উপকণ্ঠে বটতলা নামে একটি স্থানে পৌঁছায়। ছেলে ধরার একটি লোক তখন আবুল খায়েরের হাতের সোনার আংটি এবং বারেক নামে অন্য একটি ছেলের ঘড়ি কলম জোর করে খুলে নেয়।

তারপর তাদের একটি ছোট অন্ধকার ঘরে ঠেলে ফেলে দেয়া হয়। সেখানে আরো পনেরোটি ছেলেমেয়ে ছিলো যাদের বয়স ছয় হতে প্রায় ষোলো। সেখানে তিনুদি বৃদ্ধ ভিক্ষুকও ছিলো। জানালা দিয়ে অন্য আরেকটি ঘরে আরো প্রায় তিরিশটি ছেলেমেয়ে দেখা যায়।

পরদিন সকালে কয়েকটি গুন্ডা তাকে নিয়ে গিয়ে দুটো দাঁড় দেয় এবং পা মোচড়ানো শুরু করে। এরপরে একটি গরম লোহার রড দিয়ে বারেকের একটি চোখ অন্ধ করে দেয়া হয়। এভাবে আরো কয়েকটি ছেলেমেয়েকে নানা স্থানে পঙ্গু করা হয়। গুন্ডা দলটির কাছে নানাবিধ অস্ত্র এবং মেলা টাকা দেখা গেছে।

ধৃত থাকাকালীন ছেলেমেয়েদের খুবই কম খেতে দেয়া হতো। কিছুদিন পরে একটি বৃদ্ধের অধীনে আবুল খায়েরকে শিক্ষা করতে পাঠানো হয়। তারা একটি ট্রেনে শিক্ষা শুরু করে। এক সময় বৃদ্ধ ভিক্ষুকটি যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন আবুল পালিয়ে যায় এবং যশোর শহরে আসে। অতি সৌভাগ্যবশত এই শহরেই আবুলের দাদার বাড়ি এবং আবুল পথচারীদের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত সে বাড়িতে আসে এবং নিরাপদ হয়। পুলিশ জোর তদন্ত করছে।

উপরোক্ত খবরটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে, বিশেষত রাজধানী ঢাকায় আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিলো। এই সংবাদে ভীষণ বিচলিত হয়েছিলো সমাজের ভদ্রমহোদয় এবং

দুগ্ধের বিষয় এই যে আমাদের দেশের বর্তমান জার্নালিজমের মান নিম্নমানের। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে সাংবাদিকতায় ধারাবাহিকতার প্রকৃত মূল্য অনেকেই জানেন না। তাই কোনো সংবাদপত্রে পরবর্তী কোনো দিনেই প্রকাশিত হয়নি আবুল খায়েরের কি হয়েছিলো। প্রকাশিত হয়নি জনসাধারণের মনে এই সংবাদটি কি রকম প্রতিফ্রিয়ার সৃষ্টি করেছিলো। প্রকাশিত হয়নি এ ধরনের আরো ঘটনা ঘটেছিলো অথবা আজো ঘটছে কিনা। ফলে, পাঠক সাধারণ বিস্মৃত হয়েছেন সংবাদটি এবং সবাই ফিরে গিয়েছেন তাঁদের নিজ নিজ স্থানে যেখানে চাকল্য কিংবা উত্তেজনা নেই, এবং যেখানে নেই বিবেকের দংশন অথবা বুদ্ধির চর্চা। এক কথায় তাঁরা ফিরে গিয়েছেন সাধারণ নিরুপদ্রব জীবনে যা আমাদের বর্তমান নাগরিকদের সর্বাধিক কাম্য।

সে যাই হোক। রজব তালুকদার এক উঠতি নাগরিক। তার সম্পর্কে একটি সাম্প্রতিক ঘটনা প্রাসঙ্গিক বলে নিচে প্রকাশিত হলো।

ধানমন্ডির একটি দোতলা বাড়ির একতলা ভাড়াটে হচ্ছে রজব। বাড়িটি আবাসিক এলাকার বেশ ভেতরে। আশেপাশে কোনো দোকানপাট নেই। বাড়ির সামনে বেশ খানিকটা জায়গা। রাস্তার সঙ্গে দেয়ালটির পাশে বড়ো বড়ো কয়েকটি জবা ফুলের গাছ ছাড়া লেনে আর কোনো ফুলগাছ নেই। পরিবর্তে রয়েছে বালির টিপি এবং অন্য দিকে ইটের সারি। বাড়িওয়ালা দোতলায় থাকেন। এখন বাড়িটি তেতলা করার মানস করেছেন। তারই প্রস্তুতির জন্যে তিনি লনের সৌন্দর্যকে বিসর্জন দিয়েছেন।

অবশ্য এ নিয়ে রজব তালুকদার বাড়িওয়ালার সঙ্গে কোনো আলোচনা করেনি। রকমারি ফুল আর সবুজাভ ঘাস তার দৃষ্টি কোনো দিনই আকর্ষণ করেনি। প্রায়ই সজোরে ঘোষণা করে যে সূক্ষ্মরচিত মানুষ সে নয়। সরকারি অফিসে কাজ আর বাড়িতে ব্রিজ খেলায় তার প্রধান উৎসাহ।

আজ দুপুরে রজব তালুকদারের বাড়িতে ব্রিজের আসর বসেছে।

দুদিন আগে থেকেই রজব আজকের তাশ খেলার আয়োজন করেছিলো। আয়োজন অর্থাৎ অন্যান্য খেলোয়াড় যোগাড় করা। ঢাকায় ব্রিজের চারটি খেলোয়াড় জমিয়েত করা প্রায় দুঃসাধ্য। কারণ তাশারম্মা কাদু, হাইড্রোজেন, রামি প্রভৃতি খেলা পছন্দ করেন। ব্রিজে থামোখা বুদ্ধি খরচ করার যোগ্যতা বা রুচি অনেকেরই নেই। রজবের ব্রিজ খেলার আকাজক্ষা তাই সব সময় পূর্ণ হয় না। কিন্তু আজকের খেলার জন্যে যাদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিলো তারা সবাই এসেছে।

এদের প্রথম হচ্ছে ডক্টর নেয়ামুন্নাহ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক। ছোটো খাটো মানুষ এবং স্বল্পভাষী। ব্রিজ সিরিয়াসলি এবং ভালো খেলে থাকে।

দ্বিতীয় জন হচ্ছে চৌধুরী করিম আহমেদ। ব্যারিস্টার। প্র্যাকটিস এখনো গড়ে ওঠেনি। জুয়া খেলতে বেশ উৎসাহী। তাই ব্রিজে মাঝে মাঝে অসাধারণ কল দেয়। প্রচুর রিস্ক নেয়। হারেও বেশি, জেতেও বেশি।

তৃতীয় ব্যক্তি আবদুল গণি সরকারি চাকরি ছেড়ে এখন ব্যবসা করছে। মতিঝিলে একটা ট্রাভেল এজেন্সি খুলেছে। তাশে সময় বিশেষ নষ্ট করে না। কিন্তু আজ করছে। কেননা আজ এখানে একটা ছোটো ব্যবসায়ের সম্ভাবনা আছে।

ব্যবসায়ের সম্ভাবনার কারণ আজকের খেলায় হাসান ইমামের উপস্থিতি। ঢাকায় হাসান

ইমামের আগমন উপলক্ষে রজব আজকের তাশ খেলার আয়োজন করেছে। সবাই হাসানের সঙ্গে দেখা হবার আশায় এসেছে। হাসান ইমাম এদের সবার সহপাঠি ছিলো। এখন থাকে সৌদি আরবের আমেরিকান শহর দাহরানে। সেখানে আরামকোর ল্যাবরেটরিতে রিসার্চের কাজ করছে সে। আরামকো পৃথিবীর বৃহত্তম তেল কম্পানির অন্যতম। সৌদি আরবের সব তেল খনন এবং বিক্রির দায়িত্ব এই কম্পানির। বিনিময়ে এরা অগাধ রয়ালটি দিয়ে থাকেন দেশের বাদশাহ ফয়সলকে। আরামকো দাহরানে একটি শহর বানিয়েছে তাদের কর্মচারীদের বসবাসের জন্যে। এখানে সব বাড়ি ঘর এবং অফিস এয়ার কন্ডিশন। আধুনিক সব ব্যবস্থা এখানে এই মরুভূমির শহরে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু সম্ভব নয় একটি বাঙালি বৌ পাওয়া।

হাসান ইমামের বয়েস তিরিশের একটু এদিক কিংবা ওদিক। বছরে বার তিনেক দেশে আসে পাত্রীর খোঁজে। বিদেশে বহুকাল কাটিয়েছে। সেই এম.এস.সি.র পর হতেই। কিন্তু সে বাঙালি বৌ চায়। তাই দেশে এসে খোঁজ করে যায় উপযুক্ত পাত্রীর, যে প্রেসেন্টেবল হবে বিদেশেও। হাসানের বেশভূষা সুরঞ্জির নিদর্শন। চলা বসা সুভঙ্গির। তবু এতোদিন বিয়ে না হবার কারণ কোনো পাত্রীপক্ষই মেয়েকে বিদেশে বসবাস করতে দিতে উৎসাহী নন। তাতে হাসান দমে যায়নি। সে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে নানা সূত্রে।

হাসান ব্রিজ ভালোবাসে। বৌকে নাকি ও এক মাসে ব্রিজ শেখাবে। ঢাকায় এলেই রজবকে অনুরোধ করে খেলার আয়োজন করার জন্যে। আজ পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে খেলা হচ্ছিলো বলে ও খুব আনন্দিত ছিলো। ফলে সে কথা যেমন বলছিলো বেশি, কলও দিচ্ছিলো তেমনি উচু।

এই রাবারে আবদুল গণি খেলছিলো না। ও স্বোর লিখছিলো এবং ভাবছিলো হাসানকে কিভাবে বলবে ভবিষ্যতে দাহরান-ঢাকা-দাহরান টিকেট তার ফার্ম হতে কেনার কথা।

রজবের পার্টনার এবার হাসান। ডট্টর মৃধার পার্টনার ব্যারিস্টার আহমেদ। তাশ বেটে দিলো রজব আলী। ভালো তাশ পেয়েছে এবার সে। পয়েন্ট পেয়েছে সতেরো। ডিস্ট্রিবিউশনাল পয়েন্ট নিয়ে উনিশ। জোরে একটা কল দিলো সে।

ওয়ান ডায়মন্ড।

প্রি স্পেডস।

থ্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডাকলো ডট্টর মৃধা। হাসান তার উপর দৃষ্টি গেলো। সে ডাক দিলো : ফাইভ ডায়মন্ডস।

বেচারি আহমেদের তাশ আজ থ্রায় প্রতিবারই খারাপ আসছিলো। এবারো তার ব্যতিক্রম হয়নি। ওর গ্যাম্বলিং স্পিরিট মারা পড়বার উপক্রম হয়েছে। নিরুৎসাহিতভাবে সে ডাকলো।

পাস।

পাস।

রজব আলীও বললো। কিন্তু ডট্টর মৃধা ছাড়বার পাত্র নয়। সে আবার ডাকলো। ফাইভ স্পেডস।

হাসান ও আহমেদ দুজনেই পাস দিয়ে গেলো। কল ঘুরে এলো রজবের কাছে। একটু চিন্তার পর সে বললো,

সিকস ডায়মন্ডস।

মৃধা এবার পাস দিতে বাধ্য হলো। কিন্তু সবাইকে অবাক করে হাসান কল দিলো :

জি-এস ইন ডায়মন্ডস।

তার মানে তেরো পিঠ তাশের মধ্যে একটি পিঠও প্রতিপক্ষ পাবে না। আহমেদ এবং রজব পাস দিলো। মৃধার কাছে মনে হলো হাসান দুঃসাহসিকতা করছে এবং এর সমুচিত শাস্তি হওয়া উচিত। হাতের তাশগুলো আরেকবার দেখে নিয়ে ও গম্ভীরভাবে বললো,

ডাবল।

রি-ডাবল।

হাসান পাল্টা বললো। খেলা ঠিকই হলো। ডায়মন্ডসে থ্যাভল্ল্যামের গেম হলো। মৃধা ও আহমেদ এই রাবার হারলো। মৃধা বললো :

ওয়েল প্রেড।

শালা ফার্স্ট ক্লাস কল দিয়েছিলে।

রজব পার্টনারকে অকৃত্রিম প্রশংসা জানালো। হাসান চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বললো : গত বছর বেইরুতে এক আমেরিকান টিমের এগেনেস্টে এরকম একটা কল দিয়েছিলাম। কিন্তু জিতি নি। আজ সবগুলো ফিনেসই খেটে গেছে।

হাসান দুহাত টান করে দাঁড়ালো। ঠিক এমনি সময়ে পর্দা ঠেলে ঘরে এলো গৃহিনী সুফিয়া তালুকদার।

সুফিয়ার বয়েস প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ। চেহারা এবং আকৃতিতে স্বামীর প্রায় বিপরীত। ওর চেহারা একটা শহরে ছাপ আছে। লম্বায় রজবের চাইতে কিছু বেশি। ওজনেও নিশ্চয়ই। ছাই রংটা একটা সুতী শাড়ির সঙ্গে কালো ব্লাউস আর কালো চুলের মেশামেশিতে ওকে ভালো মানিয়েছিলো।

অথচ রজবের চেহারা কোথায় যেন গ্রাম্যতার আভাস রয়েছে। ওকে দেখলেই মনে হয় যেন ওর বাবা এখনো দেশে চাষাবাদ করছেন। কালো কৌকড়া অবিন্যস্ত চুল একটি অপেক্ষাকৃত বড়ো মোচালা মুখের ওপর। একটি নীল লুঙ্গি এবং টিলে পাঞ্জাবি পরে সে বসেছিলো। মাঝে মাঝে পা নাচ্ছাছিলো আর নোখ দিয়ে দাঁত পরিষ্কারের চেষ্টা করছিলো। কখনো কখনো চোখ দুটো এদিক হতে ওদিক ঘুরছিলো।

ঘরে ঢুকে হাসানের পাশে স্বামীকে ওভাবে দেখে সুফিয়া ওকে খুবই অপরিচ্ছন্ন মনে হলো। রজবের দিক হতে চোখ ফিরিয়ে নিলো সে। হাসান ওকে লক্ষ্য করছিলো। তিনটি ছোটো ছেলেমেয়ের মা সুফিয়ার চেহারার সাধারণ লাবণ্যময় কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। ক্লাস্তির এক ইশারা ওর চলায়।

হাসান বললো, কি খবর ভাবী? এতো মনমরা কেন? আপনার স্বামীকে কেমন জিতিয়ে দিলাম। এবার একটু চা-টা খাওয়ান।

আপনার ভাইয়ের মতো জীবন হলে কি আর মন মরা হতাম? ছেলেমেয়েদের কি হোলো না হোলো তার খেয়াল কি আর উনি রাখেন? সারা মাস তাশ খেলে এবং মাসের শেষে আমার হাতে বাজারের টাকা গুণে দিয়েই উনি খালাস।

রজব তালুকদার স্ত্রীর অভিযোগ অস্বীকার করলো না। সুফিয়া আরো বললো ঘরে যে একটা ম্যাচ বাকসো নেই সেকথা ওকি জানে? ওকেই জিজ্ঞেস করুন না। চা হবে কি করে?

অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে পারে ভেবে হাসানই উত্তর দিলো :

ও তাই বলুন ভাবী। ম্যাচ চাইতে এসেছেন। এই নিন আমার লাইটার। জ্যাকেটের পকেট হতে স্টেনলেস স্টিলের একটি চকচকে সুন্দর লাইটার হাসান বের করলো। তারপর একদিকে টিপ দিতেই আগুন জ্বলে উঠলো। আগুনটি নিভিয়ে লাইটার হাসান সুফিয়ার হাতে দিলো। সুফিয়া আবার টিপ দিতেই আগুন জ্বললো।

মুগ্ধ চোখে ছোটো শিখাটির দিকে তাকিয়ে ও বললো, কোনো গন্ধ নেই যে পেট্রলের।

বুটান গ্যাসের লাইটার কিনা, তাই গন্ধ নেই।

সত্যিই সুন্দর জিনিসটা।

হ্যাঁ। বুটেনের রনসন কম্পানি এ বছরই এই স্লিম লাইটারগুলো বাজারে ছেড়েছে। আমার তো মনে হয় এবার ওরা বিক্রির দিক থেকে ফ্রান্সের কলিব্রি কিংবা ডুপন্ট অথবা সুইজারল্যান্ডের ডানহিল লাইটারগুলোকে পিছে ফেলে দেবে। অবশ্য আমেরিকার জিপো লাইটারকে পেছনে ফেলা অসম্ভব।

এই পর্যন্ত বলে হাসান থেমে দেখলো সুফিয়ার মন অন্যদিকে ঘুরেছে। তারপর আবার সে বলা শুরু করলো,

জিপো লাইটার এক ফ্যানটাসটিক লাইটার। আজীবন চালু থাকার গ্যারান্টি দেয়া থাকে। যে কোনো দেশে যে কোনো সময়ে জিপো নষ্ট হয়ে গেলে অ্যামেরিকায় ওদের কারখানায় পাঠিয়ে দিলেই ওরা বিনে চার্জ সারিয়ে ফেরৎ পাঠিয়ে দেবে। জেমস বন্ড এই লাইটারটিই ব্যবহার করেন।

আপনি করেন না কেন? কৌতূহলী সুফিয়া প্রশ্ন করলো।

কারণ সহজ। আমি পেট্রলের গন্ধ সহ্য করতে পারি না। আর জিপো লাইটার শুধু পেট্রলেই চলে। মৃদু হেসে হাসান উত্তর দিলো।

মুগ্ধ সুফিয়া চা বানাতে চলে গেলো।

পেয়াল সাজাতে সাজাতে সুফিয়া ভাবছিলো। মানুষের শ্রেষ্ঠ পোশাককথা। আশ্চর্য রজব সে তথ্য জানতে চায় না, বুঝতেও চায় না। সাংসারিক জীবনের দৈনন্দিন ঘটনা ছাড়া রজব অন্য কোনো আলোচনা সাম্প্রতিকালে করেছে কিনা তা সে গভীরভাবে ভাবলো। লাইটার, জেমস বন্ড এসব তো দূরের খবর। কিন্তু এই যে এতো কাছে এতো মামলী-প্রিহল-আন্দোলন। গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ। এ নিয়ে সে তো তার সঙ্গে কোনো কথা বলেনি। হয়তো সুফিয়া সবটুকু বুঝতো না। কিন্তু কিছু কিছু বোঝার কি দাম নেই? সেই বিদ্যুৎ-ধ্বনি বোঝা মিলেই কি গড়ে উঠতো না একটা পূর্ণ সম্পর্কের জীবন? দিনে ছেলেমেয়ে আর বাড়িঘরের কথা এবং রাতে বিছানায় ডাকের পর কি রয়ে যায় না অজস্র অনুচ্যারিত শব্দ অথবা সহস্র প্রকাশিত সাড়া?

সুফিয়ার চিন্তার স্রোতে বাধা পড়লো রজবের প্রশ্নে।

হারামজাদাটা গেলো কই?

বৃষ্টি আসবে মনে হচ্ছে। ধবল-কে শেডে-র নিচে বেঁধে আনতে পাঠিয়েছি।

কেন, কি দরকার?

সিগ্রেট আনতে হবে। এতোক্ষণ ধরে খেলছি। সবারই প্যাকেট প্রায় শেষ।

রজবের কথা শেষ হতে না হতেই বাড়ির চাকরটি রান্নাঘরের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালো।

বয়স তেরো চোদ্দ। রোগা শরীরটাকে ঘিরে রেখেছে একটি ময়লা লুঙ্গি এবং অপেক্ষাকৃত বড়ো সাইজের একটি হাফ শার্ট। কিছুদিন হয় মাত্র চাকরি শুরু করেছে এই বাড়িতে। দু'বাড়ি পরই যে বাড়িটি আছে সেখানের সর্দার গোছের একটি বাবুর্চি এই ছেলেটিকে নিয়ে একদিন সন্ধ্যায় এসেছিলো এই বাড়িতে। চাকরের অভাবে তালুকদার দম্পতি বেশ অসুবিধেয় ছিলো। সুতরাং সালাম নামের এই প্রাণীটির উপস্থিতিতে ওরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলো।

অবশ্য রজব যথাযথ ইন্টারভিউ নিতে ভোলেনি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলো ওর দেশের বাড়ি ঘর আর আত্মীয় স্বজনের কথা। জানতে চেয়েছিলো ওর কাজের ফিরিশতি।

বিবি সাহেবের অসুখে রান্না করতে পারবি? ভাত-ডাল?

পারমু সাব। মিনমিনে গলায় উত্তর দিয়েছিলো ছেলেটি।

রজব ওর সরু হাড়গোড় দেখে খুব ভরসা পায়নি। তবু চাকরের আশু প্রয়োজন তাই ওকে নেয়া সাব্যস্ত করেছিলো। দরদস্তুর করে প্রাণীটির অহোরাত্র দাসত্বের দাম স্থির করেছিলো।

কতো চাস তুই?

উত্তর দিতে সাহস করেনি অনেক্ষণ ছেলেটি।

ধমকে উঠেছিলো রজব, কি লাখ টাকা চাই নাকি?

আপনার যা মনে হয় তাই দিইন সাব। তাড়া খেয়ে উত্তর দিয়েছিলো সে।

রজব বলেছিলো, আমি তো তোকে খাওয়ালেই যথেষ্ট মনে করি। তাতে তুই আর কাজ করতে আসবি না। বলে ফ্যাল ব্যাটা নগদ টাকা কতো চাস।

এই দরাদরিতে মধ্যস্থতা করেছিলো সেই সর্দার মার্ক বাবুর্চিটি। ওর দাসত্বের মাসিক দাম হয়েছিলো পনেরো টাকা। অবশ্য রজব আলী গজগজ করে বলেছিলো, বাবুর্চির জামা কাপড় ধোয়া আর ফাই ফরমাস খাটা ছাড়া বাড়িতে আর কাজ কি? এর জন্যে পনেরো টাকা দেবো মাসে? তার ওপর ঈদের লুঙ্গি? ব্যাটারা সব ধাম হতে শহরে দল বেঁধে ডাক্তার করতে আসছিস নাকি?

শেষ পর্যন্ত পনেরো টাকাই স্থির হয়েছিলো। রজব আলী ওই 'ফাই ফরমাস' শব্দ দু'টির প্রকৃত অর্থ যে কি তা ভালোভাবেই জানতো। সুতরাং মুখে শব্দগুলো ভেতরে ভেতরে একটা স্যাটিসফ্যাকটরি বারগেন হয়েছে বলে খুশি হয়েছিলো।

ওকে দোর গোড়ায় আসতে দেখেই রজব টেচিয়ে উঠলো।

হারামজাদার একটা গরু বাঁধতে এক ঘন্টা সময় লাগে নাকি? এক প্যাকেট ক্যাপস্টান আর দু'প্যাকেট গোল্ডলিফ নিয়ে আয় এক দৌড়ে।

একটু পরে গেলে হোতো না।? কি রকম বৃষ্টি আসছে বাইরে দেখ। সুফিয়া বললো।

বৃষ্টি আসবে না তো কি ওর জন্যে শরবৎ আসবে?

সেই বহু পুরনো ঢাকাই রসিকতা নতুনভাবে বলতে পেরে রজব খানিকটা আত্মতৃপ্তি লাভ করলো। কিন্তু সিগ্রেটগুলো ভিজে যেতে পারে হঠাৎ মনে হতেই বললো, 'আমার ছাতাটা নিয়ে যাস।'

রজব ফিরে এলো দ্রুয়িং রুমে। সেখানে হাসান তখন ইওরোপের বর্তমান চলচ্চিত্রে যৌনতার অংশ নিয়ে আলোচনা শেষ করে আনছিলো, ‘ক্যান্ডি’ ছবিতে ধর্ষণের দৃশ্য, ‘গার্ল অন এ মটর সাইকেলে’ পূর্ণনগ্নতা আর ‘আই অ্যাম কিউরিয়াস ইয়োলো’ ছবিতে মুখ মৈথুন। ছবিতে আর দেখানো বাকি কিসসু নেই। হাসান তার বক্তব্য শেষ করলো।

উৎসাহিত রজব জিজ্ঞেস করলো, তুমি নিজে দেখেছো ছবিগুলো হাসান?

না দেখলে কি আর বলতাম?

লাকি ম্যান।

রজব সর্ধক্ষিপ্ত মন্তব্য করলো। একটি ট্রেতে বানালো চায়ের কাপ এবং বিস্কিট নিয়ে সালাম ঘরে এলো। ধীরে ধীরে টেবিল এবং টিপয়ের ওপর কাপগুলো নামিয়ে রাখলো সে। তারপর পকেট হতে সিগ্রেটের প্যাকেটগুলো বের করে সে মনিবের হাতে দিলো। রজব বললো, ‘এই ব্যাটা, অ্যাশট্রেগুলো পরিষ্কার করে নিয়ে আয়।’

হুকুম পালন করতে গিয়ে একটি বিত্রাট ঘটলো। হাসানের চায়ের কাপ সরিয়ে অ্যাশট্রে নিতে গিয়ে কাপটি উল্টে পড়ে গেলো। কিছু চা ছিটকে ট্রাউজারে পড়লো, বাকিটুকু মেঝেতে। রজব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো, ‘শুয়োরের বাচ্চা কোনোদিনই একটা কাজ ভালো করে করতে পারিস না। দু’চারটা হাত গায়ে না পড়লে হারামজাদারা কোনো খেয়াল করে না। হারামজাদার সব টাকা এই মাসে কেটে রাখবো। সাহেবের কাপড়ের দাম কতো জানিস। হারামজাদা, শুয়োরের বাচ্চা।’

হাসান ওকে থামিয়ে দিলো। অপ্রতিভভাবে বললো,

ঠিক আছে। ঠিক আছে। ও ধুলেই চলে যাবে। যা, আরেক কাপ চা নিয়ে আয় আমার জন্যে।

চাকরটি পালিয়ে বাঁচলো। ঘরের চাঁচামেটি শুনে সুফিয়া এসেছিলো। হাসানকে সে মিস্ত্রিপট হতে ঠান্ডা দুধ লাগিয়ে দিতে বললো। এরপর চাকর শ্রেণীর অসাবধনতা এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতার ওপর রজব একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দিলো।

ও থামতেই আহমেদ বললো, আজ আমরা চলি ভাবী।

বাঃ। আমি ভাবলাম আজকে বৃষ্টির সন্ধ্যায় আপনাদের খিচুড়ি খাওয়াবো। হাসান ভাই তো খিচুড়ি পছন্দ করেন খুব।

না। আরেকদিন হবে। সন্ধ্যায় আরেক জায়গায় যাবো বন্ধুগন। হাসান বললো।

সবাই উঠে দাঁড়ালো। সুফিয়া জিজ্ঞাসা করলো, কিন্তু বাবু কি করে? বৃষ্টি পড়ছে জোরে। সে তার ট্রাভেল এজেন্টের।

আবদুল গণি উত্তর দিলো। সবাই হেসে উঠলো।

বিদায় নিয়ে সবাই চলে গেলো। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত এলো। বৃষ্টি তখনো অঝোরে ঝরছে। ওদের শোবার ঘরের বড়ো বিছানার একদিকে ছোট ছেলেটি অঝোরে ঘুমচ্ছে। আরেকদিকে রজব এবং সুফিয়া।

রজব তখন ভুলে গেছে তাশ, সিগ্রেট, চাকর, বৃষ্টি। শুধু নিয়নলাইটের বিজ্ঞাপনের মতো জ্বলছে আর নিভছে ওর মনে ইওরোপিয়ান চলচ্চিত্র সম্পর্কিত হাসানের তথ্যগুলো। অতর্কিতে রজব সরে এলো সুফিয়ার দিকে। সুফিয়া চমকে উঠলো। উপড় হয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে সে তখন ভাবছিলো শুধু একটি কথা নয়, একরাশ কথা, সারাদিনের কথা। কিন্তু কিছু বললো না। নিয়মানুগতভাবে

রজব তার কামনা চরিতার্থ করলো। সুফিয়া ওকে একটু ঠেলে দূরে সরিয়ে দিলো। তারপর সে আবার ডেবে চললো। সে এবার ভাবছিলো যে কথা রজবের একটু আগে হয়তো বা বলা উচিত ছিলো সেকথা।

পরদিন সকালে রজবের ঘুম ভাঙলো সুফিয়ার চিংকারে। রান্না ঘরের দিক থেকে শব্দটা আসছে। তাড়াতাড়ি স্যান্ডেল পায়ে গলিয়ে সে এগুলো।

কি হয়েছে?

হবে আবার কি? ঘুম থেকে উঠে মনে পড়লো কাল তোমার বন্ধুকে লাইটারটা ফেরৎ দেয়া হয়নি। রান্না ঘরে রেখেছিলাম বলে মনে পড়ছে। এখন এসে দেখি লাইটার উধাও।

লাইটার উধাও? উধাও বললেই হলো?

এটা নিশ্চয়ই হারামজাদার কীর্তি। ব্যাটা, কাল তোকে মাইনে দেবো না বলেছি বলে আজ তুই লাইটার নিয়ে সটকে পড়বি ভেবেছিলাম? হারামজাদা, আজ তোর একদিন আর আমার একদিন।

বলতে না বলতেই রজব খপ করে সালামের হাত ধরে ফেললো। অন্য হাতে সে তুলে নিলো তার পায়ের একটি স্যান্ডাল।

পরক্ষণেই আর্ত চিংকারে ভরে উঠলো সারা বাড়ি। তাকে ছাপিয়ে উঠতে লাগলো রজবের গালি এবং স্যান্ডাল এবং পরে লাঠির বাড়ির শব্দ। কানে, মুখে পিঠে সজোরে সে মেরে চললো দুর্বল জীবটিকে। সুফিয়া রজবকে টান দিয়ে থামতে বলছিলো :

আঃ ছাড়ো। ছাড়ো। মেরে ফেললে যে ছেলেটাকে।

চুপ থাকো তুমি। ছোটো লোকের জাতদের এভাবে না পেটালে চোরাই মাল পাওয়া যায় না। বানচোতকে আজ কেয়ামত দেখিয়ে দেবো।

পৌরুষ প্রমাণের হঠাৎ পাওয়া এতো বড়ো সুযোগটি রজব হাতছাড়া করতে চাইলো না।

কিন্তু তবু লাইটার পাওয়া গেলো না। চাকরটি শেষ অবধি বলেই গেলো যে লাইটার মানে কি ও জানে না এবং ও রকম কোনো জিনিস সে দেখে নি।

সারা শরীরে চাপ চাপ রক্তের দাগ নিয়ে সে পড়ে রইলো সিঁড়ির ঘিটে তার মাদুরের বিছানার ওপর। একটু পরেই কাঁপুনি দিয়ে ওর জ্বর এসে গেলো। বিরক্ত মুখে রজব অফিস চলে গেলো।

দুপুরের দিকে রজবের অফিসে টেলিফোন বেজে উঠলো। সুফিয়া দু'টি সংবাদ জানালো।

প্রথমত চাকরটি পালিয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত লাইটারটি পাওয়া গেছে। রান্নাঘরেই একটা প্লেটের নিচে চাপা পড়েছিলো!

আর তৃতীয় যে সংবাদটি তারা জানলো না সেটি হলো সেদিনের গ্রহাণু সালামের শ্রবণ শক্তি নষ্ট হয়েছিলো চিরদিনের জন্যে। বাধ্য হয়ে আপাতত সে শিক্ষা বৃত্তি বেছে নিয়েছে।

লন্ডনের হোবর্ন আন্ডারথ্রাউন্ড স্টেশনের কাছেই বিশ্ববিখ্যাত লিংকস ইন। এ রকম আরো তিনটি ইনস অফ কোর্ট লন্ডনে আছে। আজকাল প্রায় আড়াইশো পাউন্ড, বেসরকারিভাবে যার দাম পাঁচ হাজার টাকা, দিলে এবং উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে কাউন্সিল অফ লিগ্যাল এডুকেশনের মাধ্যমে এ ধরনের ইনস অফ কোর্টে নাম লেখানো যায়। এই ইনগুলো হতেই ব্যারিস্টারদের জন্মগ্রহণ হয়ে থাকে যারা চকচকে জুতো, স্ট্রাইপড ট্রাউজার, হোয়াইট কলার এবং ব্ল্যাক জ্যাকেট পরে কোর্টে আইন ব্যবসায় করেন। এদের দুটো পরীক্ষায় পাশ করতে হয়, ফার্স্ট পার্ট এবং ফাইনাল। এবং আরো একটি বিচিত্র যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। সেটি হলো এদের প্রতি টার্মে অন্ততপক্ষে তিনটি ডিনার খেতে হয় এবং অন্ততপক্ষে আটটি টার্মের ডিনারে যোগ দিতে হয়। অর্থাৎ কমপক্ষে মোট চব্বিশটি ডিনার খেতে হয়। এই ডিনারগুলোই হচ্ছে পরীক্ষার্থীদের পার্সেন্টেজ। পৌনে তিন বছরে চব্বিশটি ডিনার খাওয়া এবং পরীক্ষা দুটি পাশ করা সম্ভব।

অন্য তিনটি ইনের চাইতে লিংকস ইনের প্রতি দেখা গেছে আমাদের ছাত্রদের মোহ বেশি। এর কারণ আছে অনেক। তবে উল্লেখযোগ্য অন্যতম কারণ এই যে, আমাদের উপমহাদেশের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি এখান হতেই আইন পাশ করেছেন।

আর যারা এখনো খ্যাতি লাভ করেনি তাঁদের মধ্যে মিঃ চেরাগ আলীর নাম উল্লেখযোগ্য।

চেরাগ আলী বিলেত হতে সদ্য দেশে ফিরেছে। বয়েস প্রায় তিরিশেক হবে। ওর সঠিক বয়স যে কি তা ওর ঘনিষ্ঠতম বন্ধুরাও জানে না। সি.এস.এস পরীক্ষার কথা ভেবে বহু পূর্বে সে তার নিজের বয়স চুরি করেছিলো। এখন তাই প্রকৃত বয়েস বলতে সংকোচ বোধ হয়। বেশ লম্বা ওর আকৃতি। সুস্বাস্থ্য এবং সুদর্শনের মালিক। বাচনভঙ্গি আকর্ষণীয়। প্রথম দৃষ্টিতে কাউকে দেখলে মনে হয় চালাক, কাউকে বা বোকা, কাউকে বা সরল, কাউকে বা কুটিল। চেরাগ আলীকে দেখলে মনে হয় চটপটে। আর চরিত্র বিষয়ে সরল বাংলায় বলা চলে ছাত্র। সেই বয়স চুরি ছাড়া আর বিশেষ গুরুত্বের কোনো পাপকার্যে চেরাগ কখনো লিপ্ত হয়নি।

প্রায় আট বছর বিলেতে থেকে চেরাগ আলী পৌনে তিন বছরের কোর্স সম্পূর্ণ করে ব্যারিস্টার হয়েছে। দেশে তার শুভাকাঙ্ক্ষীদের সন্দেহ হয়েছিলো চেরাগ সত্যিই ফাইনাল পরীক্ষা পাশ করেছে কিনা। তাদের দৃষ্টিভ্রান্তি কববার জন্যে চেরাগ সত্যিই দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলো। লন্ডনের দুটো দৈনিক পত্রিকা টাইমস এবং টেলিগ্রাফে যেদিন তার নাম সম্বলিত পরীক্ষা উত্তীর্ণের খবরগুলো বেরিয়েছিলো সেদিন চেরাগ কয়েক কপি কিনে রেখেছিলো। কোনো কথোপকথনে যদি ওর মনে হয়েছে তার শুভাকাঙ্ক্ষীদের মনে সন্দেহের কালো মেঘ বিচরণ করছে তখনই সে তার ব্রিফকেস হতে টাইমস বের করে অবলীলাক্রমে বলেছে :

আমাদের ডিগ্রি আর সব বিলিতি ডিগ্রির মতো নয়। আমাদেরই শুধু পুরো নাম শুদ্ধ পরীক্ষার ফল বের হয় টাইমস আর টেলিগ্রাফে। এই দেখুন। সবুজ কালিতে আমার নাম আন্ডার লাইন করা আছে।

সাধারণত শতকরা নব্বইজনই তৃতীয় বিভাগে অথবা কমপার্টমেন্টালে আইন পরীক্ষা পাশ করে থাকেন লন্ডনে। এই নির্দোষ সত্যটি জানা না থাকায় অনেকে বিশ্বিত কিংবা বিচলিত হয়ে চেরাগ আলীকে সহানুভূতিসূচক প্রশ্ন করেন,

আহা। থার্ড ক্লাসে দেখছি পাশ করেছো। অসুখ হয়েছিলো বুঝি?

কণ্ঠ দিয়ে তাদের একরাশ উৎকণ্ঠা ঝরে পড়ে।

এ প্রশ্ন চেরাগ আলীর কাছে একেবারে নতুন। কারণ লন্ডনে যতো বারই ফেল কেউ কন্সক না কেন, পাশ করবার পর সব খুন মাফ। প্রসব বেদনার পর পুত্রের মুখ দেখে মা যেমন সব যন্ত্রণা বিস্মৃত হন, ঠিক তেমনই টাইমস টেলিগ্রাফে নিজের নাম দেখার পর পরীক্ষার্থী তার সকল অতীত অকৃতকার্যতার গ্রানি চিরবিস্মৃত হন। অথচ দেশে একি বিড়ম্বনা? কিন্তু চেরাগ আলী এম এ বার-অ্যাট-ল। দমবার পাত্র নয়। তারকাজই হচ্ছে সমস্যা মূলক প্রশ্নের সমুচিত উত্তর দেয়া। সুতরাং সে উত্তর দিয়েছে।

কান্ডির জন্যে লন্ডনে পলিটিকস করেছে এতোদিন। ডিগ্রি তো নিতামই না। বলতে পারেন মলমূত্র এবং রীর্ষ ত্যাগ ছাড়া মুসলমানরা আর কোনো ত্যাগ করেছে কি? আমি সব ক্লাস ত্যাগ করেছি। এই যে থার্ড ক্লাস এতো সেই স্যাক্রিফাইসের ফল। যদিও মিনিমাম স্যাক্রিফাইস, তবু এর জন্যে আমি গর্বিত। ভবিষ্যতে বড়ো স্যাক্রিফাইসের জন্যে আমি প্রস্তুত হচ্ছি।

পরীক্ষা পাশের পর হতেই চেরাগ আলী দেশে ফেরার চেষ্টা করেছে। সদ্যপাশ করা যুবকের পক্ষে দেশে ফেরা কিন্তু সহজ নয়। একটা গাড়ির পয়সা জোগাড় করতে হয় প্রথমে। তারপর আছে একটা ডিনার জ্যাকেট, টেপ রেকর্ডার, শার্ট, ট্রাউজার, বন্ধু বান্ধবের জন্যে টাই, ইত্যাদি। প্রায় সাত আটশো পাউন্ডের ধাক্কা। বছর খানেক চেরাগ আলী থ্রেটার লন্ডন কাউন্সিলের স্কুলে কাজ করেছে দিনে বাচ্চাদের শিক্ষক হিসেবে। আর রাতে পার্ট টাইম কাজ করেছে গোল্ডেন এণ্ড রেইস্ট্রেট কিচেন সেকশনে। অমানুষিক পরিশ্রম হয়েছে কিন্তু টাকা জমেছে। বাকলি স্কোয়ারে রুটস কম্পানিতে অর্ডার দিয়ে একটি হিলম্যান গাড়ি কিনেছে সে। দেশে কাস্টমস ডিউটি কমানোর উদ্দেশ্যে বিলেতেই গাড়ি ডেলিভারি নিয়ে মাস দুয়েক চালিয়েছে সে গাড়িটি।

এখন চেরাগ এসেছে এই শহরে। চট্টগ্রামে। গাড়ি জেঁদতে নেমেছে। চেরাগ আলীর উদ্দেশ্য কাস্টমস ঝামেলা শেষ করে, ডিউটি দিয়ে গাড়ি ট্রাইভ করে ঢাকা যাওয়া।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে চেরাগ আলী দূরদর্শী। তাই খোঁজ নিয়ে জেনেছিলো যে দেশে বর্তমানে লাল ফিতের দৌরাখ্যের চেয়ে বেশি দৌরাখ্য হচ্ছে লাল নোটের। আসার পথে করাচিতে তার এক সুহৃদ হরকৎ আহমেদকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করায় সে বলেছিলো, এভরিবডি হাজ গট এ প্রাইস। টাকা দিয়ে কেনা যায় না এমন লোক আজকের পৃথিবীতে কমই আছে চেরাগ। পাকিস্তানে নেই বললেই চলে। ওন্লি পয়েন্ট হচ্ছে ক্রেতার অ্যাপ্রোচ দিয়ে প্রাইস ঠিক করতে হবে। বোকার মতো স্বেচ্ছায় কোথাও টাকা সাধতে যেয়ো না। অলওয়েজ ইন্টারমিডেয়ারি দিয়ে কাজ সেবো। শুধু মনে রেখো, আমাদের দেশ যেতো ব্যাকওয়ার্ডই হোক না কেন, ফিনানশিয়েলি ভেরি প্রোগ্রেসিভ। বললাম না, এভরিবডি হাজ এ প্রাইস এবং যে যেখানে যতো পারছে এই প্রাইস আদায়

করে নিচ্ছে। লোকের পকেটে তাই এতো টাকা আর সেই টাকা জমা নেবার জন্যে পানের দোকানের মতো এক রাশ ব্যাংক আজকাল দেশে গজিয়ে উঠেছে।

করাচিস্ত সুহদ হরকৎ আহমেদের উপদেশবাণী চেরাগ আলী তার অন্যতম মূলমন্ত্র করে নিয়েছিলো। যে চেরাগ আলী বিদেশে এক শিলিং টিপস দিতে দু' মিনিট চিন্তা করতো সেই চেরাগ আলী আজকাল পকেটে নানা মানের একতাড়া নোট রেখে অফিস আর বন্দর দৌড়াদৌড়ি করছে।

আওলাতাই মাওলাভাই ট্রেডিং কর্পোরেশনের অফিস যেখানে, বাসাও সেখানে। ছোট একতলা বাড়ি। ব্যবসায়ে পয়সা হওয়া সত্ত্বেও বাড়িটা দোতলা হয়নি। কারণ বাড়িটা টিনের একেবেলমাত্র ভিত্তিই পাকা। সুলেখা চিত্রালয়ের অথকিত সুবিরাট সাইনবোর্ড বাড়ির সামনে টাঙানো। এই টিনের বাড়ির চেহারাটির একটি গুডউইল সৃষ্টি হয়েছে বাজারে এ কথা ব্যবসায়ের সোল প্রোপ্রাইটার মিঃ কোরবান উদ্দিন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি আর দেয়াল তোলেন নি।

কোরবানউদ্দিন সাহেবের আকৃতি ছোট, বর্ণ কালো, চেহারা পাকা ব্যবসায়ী গোছের। একটা বাদামি রংয়ের ফিয়াট ছশো গাড়িতে ঘুরে বেড়ান প্রায় সময়ই। মূল ব্যবসা হচ্ছে ক্লিয়ারিং এজেন্সির। এই উপলক্ষে গত কয়েক বছরে তিনি কাস্টমস, জেটি, স্টেট ব্যাংক এবং ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট অফিসের লোকদের নড়িনক্ষত্র নখদর্পণে এনে দেখেছেন। তাঁর সে দর্পণ বেলজিয়ান গ্লাসের চেয়েও দুর্মূল্য। কারণ তিনি প্রতিটি ছোট কেরানী হতে বড়ো অফিসার পর্যন্ত সবাইকে ভালোভাবে চেনেন। তাই তাঁর ব্যবসায়ে এতো সাফল্য। দু'তিনটে টাইপরাইটার, চার পাঁচজন ক্লার্ক, সরকার, ম্যানেজার প্রভৃতি সবাই আছে তার অফিসে। ইন্টারমিডিয়রি হিসেবে তার তুল্য ক্লিয়ারিং এজেন্ট চট্টগ্রামে কমই আছে।

বলাবাহুল্য চেরাগ আলী আওলাতাই মাওলাভাইকেই তার গাড়ির ক্লিয়ারিং এজেন্ট নিযুক্ত করেছে। ইনভয়েস, 'এ' ফর্ম, পাসপোর্ট, ইনকাম সার্টিফিকেট প্রভৃতি গাড়ি সম্পর্কিত সব কাগজপত্র দিয়ে চেরাগ কোরবানউদ্দিনকে প্রশ্ন করলে,

এখন বলুন মোট কতো ডিউটি দিতে হবে?

মিনিট কয়েক চুপ থেকে কোরবানউদ্দিন উত্তর দিলো,

নর্মাল ডেলিভারিতে বারো হাজার আর সিজারিয়ান ডেলিভারিতে নয় হাজার টাকা। এই আমার মোটামুটি ধারণা। দু'চারশো এদিক ওদিক হতে পারে – তার বেশি নয়।

কোরবানউদ্দিন এক হাতের পাঁচ আঙুল অন্য হাতের পাঁচ আঙুলের ফাঁকে ঢুকিয়ে বসলো। কিন্তু বিমূঢ় চেরাগ প্রশ্ন করলো,

জি, আপনার কথাটা ঠিক বুঝলাম না।

বুঝবেন না যে তা জানতাম। বহুদিন ফরেন ছিলেন কিনা। নিজের দেশের ভাষা ভুলে গেছেন।

কিন্তু সিজারিয়ান মানে –

ওকে মাঝপথে থামিয়ে কোরবানউদ্দিন বললো,

ওটা বিলাতি মানে। আমরা এই বিজনেসে এই দেশে ওটার অন্য মানে করি। নর্মাল ডেলিভারি মানে আপনার গাড়ির ওপর ডিউটি প্রভৃতির এ্যাসসেসমেন্ট হবে নর্মাল। অর্থাৎ আইনত আপনার যতো টাকা দেয়া উচিত তাই দেবেন। কিন্তু তা যদি দিতে চাইতেন তাহলে কি আর কোরবানউদ্দিনের কাছে আসতেন?

আঙুল ছাড়িয়ে দুহাত ছড়িয়ে ফ্যা ফ্যা করে উনি হেসে উঠলেন। চেরাগ বেশ একটু বিব্রত বোধ করলো। সুট টাই পরা সত্ত্বেও ভদ্রলোক ওকে এইভাবে উলঙ্গ করে দিলেন বলে। নার্ভাস হয়ে সিগারেট নিজে ধরালো এবং আরেকটি কোরবানউদ্দিনকে দিলো। হাসি থামিয়ে কোরবানউদ্দিন বললো, আর সিজারিয়ান হচ্ছে আপনি কতো কম টাকায় গাড়ি নিতে পারেন। তবে সব সিজারিয়ান অপারেশনের মতোই এখানে আছে বিরাট রিস্ক – কেস সাকসেসফুল হতে পারে, না-ও পারে।

গলাটা ভারি হয়ে আসে তার।

নিজেকে ইতিমধ্যে সামলে নিয়েছে চেরাগ আলী। থ্রি কাসলস সিগারেট হরলিকসের কাছ করেছে। সোজাসৃজি সে ব্যবসায়ে নামে।

না-ও হতে পারে? আমিতো করাচিতে শুনলাম উপযুক্ত টাকায় সবই সম্ভব।

হ্যাঁ, সম্ভব – করাচিতে। আমরা বাঙালি, আমাদের শরীর যেমন ছোট, দিলও তেমনি ছোট। আমরা তাই বেশি দিতেও পারি না। বেশি নিতেও পারি না। সেজন্যে অনেক কেস এখানের লোকজন হাতে নিতে চান না। বলেন টু হট। এখানে ছোট কেসই বেশি চলে।

তাহলে কতো পড়বে?

আমার মনে হয় আপনার গাড়ির সিজারিয়ান ডেলিভারিতে ডিউটি ইত্যাদি পড়বে সাত হাজার। ফিস দু'হাজার। হলো গিয়ে নয় হাজার। আপনার বাঁচলো তাহলে তিন হাজার। বাকী তাহলে আলী সাহেব কোন দিকে এগুবেন?

বেশ। নয় হাজারই সই।

বেশ। আপনার এসব কাগজপত্র রেখে যান আমার কাছে। আমি আধুনিক ফোন করে জানাবো কি করতে হবে। ইতিমধ্যে একটা কথা মনে রাখবেন। গাড়ির কথা কারুর সঙ্গে বলবেন না। বেমালাম চেপে যাবেন। সাইলেন্স ইজ কি টু দি সাকসেসফুল ডিস বিজনেস।

পথে নেমেই বেবি ট্যাকসি পেয়ে গেলো। ট্যাকসির নাম 'আশার আলো'। ফুল মার্কা অক্ষরে বড়ো করে পেছনে লেখা। গুড অমেন মনে হলো চেরাগ আলীর। শেষ বারের কতো সমস্ত ব্যাপারটা তাবলো সে। ভেবে সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে সে সঠিক পথেই এগুচ্ছে। কনশেন্স এবং সর্শিফার ফলে কোরবানউদ্দিনের অফিসেও যে কয়েকটি মুহূর্তে অবস্থি অনুভব করেছিলো তার জন্যে নিজেকে ধিক্কার দিলো। পাকিস্তানে পাকিস্তানি হওয়া উচিত। কলেজ জীবনে সংগৃহীত উপদেশ, বি এ রোমান হোয়াইল ইন রোমের স্থানান্তর করতে হবে। নইলে সব পণ্ড হবে। নিজেকে শক্ত করো চেরাগ – এই আত্মপ্রত্যয়ের সংকল্প নিয়ে সেদিন সে বাড়ি ফিরলো। একটা প্রশ্ন করা হয়নি ভেবে একটু খচখচ করলো সেদিন শোবার সময়। প্রশ্নটা নেহায়েতই মামুলি। কোনো আর্থিক সম্পর্ক নেই। প্রশ্ন হচ্ছে মালিকের নাম কোরবানউদ্দিন কিন্তু ব্যবসায়ের নাম আওলাতাই

মাওলাভাই ট্রেডিং কর্পোরেশন কেন?

দিন পাঁচেক কেটে গেছে তারপর। দু'দিনবার ফোন করেও কোরবান উদ্দিনকে অফিসে পায়নি সে। চট্টগ্রামে ইতিমধ্যে ও হাঁপিয়ে উঠেছে। ফিল্ম ম্যাগাজিনে গুটি কয়েক নায়ক-নায়িকার একই ছবি ও একই সংবাদ পড়ে 'কানা খানা ঘানা, একই কুমীর ছানার' গল্প ওর জীবনে সত্যি হয়েছে বলে চেরাগ মুষড়ে ছিলো।

তাই সেদিন বিকেলে হঠাৎ মাওলাভাইয়ের এক ক্লার্ক ফোন করে যখন জানালো যে কোরবানউদ্দিন সন্ধ্যাবেলায় দেখা করতে বলেছেন তখন চেরাগ বেশ চাঞ্চল্য অনুভব করলো। ঠিক সন্ধ্যা হতেই ও রওনা দিলো। গিয়ে দেখলো কোরবানউদ্দিন আছে একা। অফিসেই দু'চারটে কাগজ ঘাটাঘাটি করছিলো। কিন্তু ওকে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে সাদর সন্ধ্যাষণ জানালো।

আসুন, আসুন। তারপর কেন আসছেন? চিটাগাং কেমন লাগছে?

খুব ভালো। মিথ্যে একটা উত্তর দিতে বাধ্য হলো চেরাগ।

ভালো, ভালো। যাক আপনি ঠিক সময়েই এসে গিয়েছেন। চলুন, আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমি ভদ্রলোককে কথা দিয়েছি আটটার মধ্যেই পৌঁছুবো বলে।

কি আশ্চর্য। কোথায়?

ও হোঃ। আপনাকে বলাই হয়নি। আমাদের যেতে হবে ডাক্তার সাহেবের কাছে।

কোরবানউদ্দিন রহস্যময় হাসি হাসলো।

তার মানে? চেরাগ আবার প্রশ্ন করলো।

তার মানে হায়াৎ আলী আখন্দের কাছে।

হায়াৎ আলী আখন্দ? কে বলুন তো?

উনি এক কর্মচারি। আপনার গাড়ি বিষয়ে ওরই সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন। কেস হাতে নেবার আগে ওরা রুগী স্বচক্ষে দেখে নিতে চান। বুঝলেন আলী সাহেব, ইনফর্মারের অভাব নেই দেশে। কে যে কোথায় কখন ফাঁদ পাতে বলা মুশকিল। সবাই তাই একস্ট্রা কেয়ার নিচ্ছে কাজ করতে চান।

বেশ তো চলুন। কিন্তু ভদ্রলোকের নামটা বড়ো চেনা মনে হচ্ছে উনি কি বগুড়ার লোক?

হ। ঠিকই ধরেছেন দেখছি। আপনি চেনেন নাকি ওকে?

চিনি বলেই তো মনে হচ্ছে। বিলেতে যাওয়ার আগে আমার এক দূরসম্পর্কের মামা এ লাইনে চাকরি নিয়েছিলেন শুনেছি। উনি যে এখানেই আছেন তা হ্যাঁজাম না।

চমৎকার। তাহলে তো আর কোনো প্রবলেমই নেই। চলুন, চলুন।

ফিয়াট ছ'শোতে ওরা দু'জন রওনা দেয়। হঠাৎ সেই রাতের প্রশ্নটা চেরাগ আলীর মনে হতেই বললো,

আচ্ছা, আপনার বিজনেসের নামটা এ রকম কেন?

আর্থিক কারণে আলী সাহেব। আর্থিক কারণে। আমার নামে বিজনেসের বি-ও হতো না। অথচ এইনামে দেখুন কি অবস্থা। বাঙালির নামও বিজনেসে অচল। চিন্তা করুন, আপনার নামে কোনো বিজনেস কাটবে কি? অথচ দেখুন না কেন, ইসমাইলিয়াদের নামেই কি রকম ব্যবসায়ের গন্ধ। যাদের নেই তারাও ভুল সংশোধন করে নেন। যেমন ধরুন আহমদ আলী। ভীষণ ডাল নাম বিজনেসের জন্যে। কিন্তু বিজনেসে গেলেও নাম হবে আহমদ আলী কোহাটাওয়ালা, কিংবা কর্ণাটাওয়ালা, কিংবা বন্দুকওয়ালা, কিংবা চেয়ারওয়ালা, যে কোনো কিছু একটা ওয়ালা! আপনি

আর আমি পিতৃপ্রদত্ত নামের পেছনে ওরকম একটা কিছু লাগিয়ে শুরু করতে গেলে আত্মীয়স্বজন পাগল ঠাওরাবে। আপনিই বলুন পাগল কে? এই যে এসে গিয়েছি।

কোরবানউদ্দিন ব্রেক কষলো। গাড়ি থামলো একটি ছিমছাম দোতলা বাড়ির সামনে। ছোটো গেট পেরিয়ে কলিং বেল টিপতেই স্বয়ং হায়াৎ আলী আখন্দ বেরিয়ে এলেন। পরণে লুঙ্গি এবং ফতুয়া।

আসুন, আসুন।

আরে আলী সাহেব যে আপনার ভাগ্নে হন তাতো জানেনই না। ঘরে ঢুকতে কোরবানউদ্দিন বললো।

একি চেরাগ যে। কবে ফিরলে তুমি।

চেরাগ সালাম করতে অগ্রসর হলো। এসে নিজের বাবা মাকে ছাড়া আর কাউকে সালাম করেনি। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি ভিন্ন। আখন্দসাহেব ওকে থামিয়ে দিলেন।

এই তো সপ্তা দুয়েক হয় ফিরেছি।

আর একবারো বুঝি সময় হলো না এতোদিনের মধ্যে? একেবারে সাহেব হয়ে গিয়েছো?

সত্যি মামা, সময়ই হয়নি। এ কদিন এতো ছোটোছুটিতে গেছে।

কই রে জরিনা, সখিনা। এদিকে আসিস না কেন? হায়াৎ আলী তার সরু গলা ইঠাৎ বকের মতো তুলে উঁচু করে ডাক দিলেন।

পর্দা ঠেলে একটি সতেরো আঠারো এবং আরেকটি তেরো চোদ্দ বছরের মেয়ে ঘরে এলো।

দ্যাখ, কে এসেছে। তোদের রোকেয়া ফুফুকে মনে আছে না? তারই ছেলে চেরাগ। এই সেদিন বিলেত হতে ফিরেছে। যা, ওকে নিয়ে যা ভেতরে তোদের মা-র কাছে।

অনুগতভাবে চেরাগ হায়াৎ মামার নির্দেশ পালন করলো। মামী তাকে সেদিন প্রচুর আদর আপ্যায়ন করলেন। কোরবানউদ্দিনও বাদ গেলো না।

আকর্ষণ খাওয়ার পর একটা পান মুখে গুঁজে দিয়ে বাড়ির পথে রওনা দিলেন কোরবানউদ্দিন চেরাগ আলীকে নিয়ে। গাড়িতে স্টার্ট দেবার আগে পকেট হতে একটা ক্রিশ প্রফ সিগারেটের প্যাকেট বের করে চেরাগকে সাধলো।

রথম্যান কিংসাইজ দেখছি। বিলিতি সিগারেট কোথায় পেয়েছ
ব্ল্যাকে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলো কোরবানউদ্দিন ঈষৎ বিরক্ত হয়ে। চেরাগ ওর মনোভাব হয়তো বুঝতে পারলো। তাই কিছুক্ষণ চুপ থাকলো।

আপনাকে যখন মিঃ আখন্দ চিনতে পেরেছেন তখন কাজটা সহজেই হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, আমরা তাই মনে হলো। তবে আপনার ইন্ট্রাকশন অনুযায়ী গাড়ি সম্পর্কে কোনো কথাই তাকে বলিনি।

সেটাই প্রকার। যাক, আমি দিন কয়েকের মধ্যেই ফলাফল জানিয়ে দিতে পারবো আশা করছি। আগামী সপ্তাহে এই সময়ে নিজের গাড়িতেই ঘুরে বেড়াতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

ইনশাআল্লাহ।

আত্মগতভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলো চেরাগ। কোরবানউদ্দিনের গাড়ি ওকে নামিয়ে দিয়ে রাতের অন্ধকারে মিশে গেলো।

এরপরেই ঘটনার দৃশ্যপট কিছু হঠাৎ বদলে গেলো। কুমার চেরাগ আলী প্রথম দর্শনেই কুমারী জরিনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলো। প্রায় লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট।

ফলে পরবর্তী সন্ধ্যায় আত্মীয়তা সুবাদে চেরাগ পুনরায় মামার বাড়িতে আবির্ভূত হলো। এক বাকসো বম্বে সুইটমিটসের মিষ্টি নিয়ে গিয়েছিলো এবং বলা বাহুল্য ওর মামী তাতে খুবই প্রীত হয়েছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি চেরাগ খালি হাতে এলেও উনি প্রীত হতেন।

মেয়ে বড়ো হয়েছে—এ কথা তিনি এবং তাঁর স্বামী আজকাল প্রায়ই বলতেন। প্রথম মেয়ে। তাই কোনভাবে পাত্র খোঁজ শুরু করবেন ওঁরা তা ভেবে পাচ্ছিলেন না। হঠাৎ হাতের কাছে যেন চাঁদ পাওয়া গেলো। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। সুতরাং দ্বিতীয় সন্ধ্যায় চেরাগের সমাদর হলো অধিকতর। চেরাগের পক্ষে আরো স্বরণীয় সন্ধ্যা ছিলো এই জন্যে যে ঠিক ফরমূলা অনুযায়ী হঠাৎ ঘর হতে মামী এক অজিলায় ওকে আর জরিনাকে রেখে চলে গেলেন। প্রথম কয়েক মিটিন দু'জনাই চুপ ছিলো। তারপর চেরাগই কথা শুরু করে,

সন্ধ্যা বেলায় কি করো তোমরা?

কি আর করবো? বই পড়ি অথবা রেডিও শুনি। দেখুন তো কি ইনজাস্টিস করা হচ্ছে আমাদের এই টিটাগাং শহরের ওপর। কুমিল্লা পর্যন্ত টেলিভিশন এসে গিয়েছে অথচ এখানে কিছুই হলো না এখনো।

বাঃ তুমি তো বেশ কথা বলতে পারো। কলেজ পলিটিকস করো না কেন?

চেরাগ মুচকে হেসে বললো। প্রত্যন্তরে জরিনা এক ঝলক লাজুক হাসি হাসলো। বেশ সুন্দর গড়ন তার। পূর্ণ যৌবনে নিশ্চয়ই আরো সুন্দর হবে। সেদিন সন্ধ্যায় কতোক্ষণ যে ওরা কথা বললো তার হিসেব হারিয়ে গিয়েছিলো। মাঝে একবার মামী চা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। জরিনা বিলেত ইওরোপ সম্বন্ধে খুবই উৎসাহ প্রকাশ করলো। সুতরাং চেরাগ তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করে অকৃপণভাবে বিলেতের কথা ধারাবাহিকভাবে শুরু করলো।

পরদিন চেরাগ দুপুরেই এসে উপস্থিত মাতুলালয়ে। দুটোর পর আর কিছু থাকবে না বলেছিলো জরিনা। মামীও খুব খুশি হলেন। দুপুরে সবাই এক সঙ্গে খাওয়া দাওয়ার পর বাড়ির আর সবাই ওদের দু'জনকে একা এক ঘরে রেখে ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়ে গেলো। ব্যবস্থাটি এতোই প্রকট যে জরিনা অনেকক্ষণ চেরাগের দিকে তাকাতেই পারেনা না। চেরাগই নিস্তকতা ভাঙলো।

কি ব্যাপার?? আজ যে এতো চুপচাপ? আমি তো আপনাকেই এলাম তোমার কথা মতো।

বাঃ রে। আমি আবার কখন আপনাকে অগ্রে আসতে বলেছিলাম?

খুব চালাকি হচ্ছে, না? কাল যাবার সময় যে বললে আজ দুটোতেই তোমার ক্লাস শেষ। সে কথাটার মানে কি?

মানে আবার কি? মানে কিছুই না। আমি কি করে জানবো যে ও কথা বললেই আপনি দু'টোর পরই এখানে আসবেন?

ও। সে কথা বুঝি তোমার জ্ঞানার এখনো বাকি আছে?

জরিনা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলো। চেরাগ সোফা ছেড়ে ওর কাছে এসে দাঁড়ায়। জরিনা উত্তর দিলে :

ব্যারিস্টারদের সঙ্গে নাকি কথায় পেরে ওঠা যায় না। আপনি দেখছি তার ব্যতিক্রম নন।
ব্যতিক্রম কিন্তু আজ হতে চেয়েছিলাম। তোমার কলেজেই চলে যেতে চেয়েছিলাম। গেটের
সামনে একটা সারপ্রাইজ দিতাম। কিন্তু সাহস হলো না।

ওরে বাবা। আপনি দেখছি সাংঘাতিক মানুষ। ঘরে বাইরে তাড়া করে ফিরতে চান।
কেন? তোমার আপত্তি কোথায়?

জরিদা সরাসরি প্রশ্নে মূক হয়ে গেলো। কথার মাঝে কখন যে চেরাগ তার এক হাত ধরে
ফেলেছে এবং কখন যে তার এতো সান্নিধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে জরিদা তা বুঝে উঠতে পারেনি।
চেরাগের শরীরের সব উষ্ণতা নিমেষের মধ্যে ওর শরীরের সঞ্চারিত হচ্ছিলো। এ উষ্ণতার স্বাদ
অন্য রকম। চেরাগ আরো কাছে ওকে টেনে নিলো। কলেজ এবং শহরের অন্যান্য ফ্যাশন উপলক্ষে
দু'চারটে যুবকের সঙ্গে যে ওর মেলামেশা হয়নি তা নয়। কিন্তু পিতামাতার আশীর্বাদ নিয়ে নিজের
ঘরে একজন প্রায় অপরিচিত যুবকের সঙ্গে এমন ধরনের সংলাপ ও সান্নিধ্য তার এই আঠারো
বছরের নিষ্কলঙ্ক জীবনে প্রথম। কি বলবে, কিংবা কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলো না ও।
সত্যিই কি ওর এই পরিণত যুবক বিলেত ফেরত ব্যারিস্টারকে এতো ভালো লেগেছে? নিজের
মনকে তো এ প্রশ্ন করবার সময়ই পায় নি। ওকে তো সে এখনো চেনেই না। জরিদার অন্যমনস্কতা
ভালো চেরাগের প্রশ্নে,

কই উত্তর দিলে না যে?

বাঃ। সময় দিলেন কোথায়?

নিজেকে একটু ছাড়িয়ে নিলো জরিদা।

বেশ তো। এখন বলো।

আচ্ছা তাহলে আগামীকাল আসুন। কলেজেই। চারটের পরে।

চমৎকার। তাহলে কালকেই বাকি কথা হবে। কলেজ থেকে কোথাও চলে যাবো।

ঠিক চারটের সময়ে তাহলে আসবেন কিন্তু। আর সবাই তখন চলে যাবে। আমি একদম একা
পড়ে যাবো। কিছুতেই দেরি করবেন না যেন।

‘পাগল। শোনো নি বিলেত ফেরতারা পাণ্ডুয়ালিটির কেমন দাম দেয়।’ চেরাগ তার টাইটা
খেলা করতে করতে মিত হেসে উত্তর দিলো।

এর পরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত। তার পরের দিনই চেরাগ আলী কাস্টমস ডিউটি, জেটি ফি প্রভৃতি
দিয়ে গাড়ি পেয়ে গিয়েছিলো। অপ্রত্যাশিতভাবে একটা আগেই গাড়ি পেয়ে গেলো সে। কিন্তু তাতে
নয়, কোরবানউদ্দিন অবাক হয়েছিলো অন্য কারণে। হায়াৎ আলী আখন্দ এক পয়সাও চার্জ
করেননি। চেরাগ আলী মাত্র সাত হাজার টাকাতেই গাড়ি পেয়ে গেছে। কোরবানউদ্দিন তার
অনুভূতি চেপে থাকতে না পেরে বলেই ফেললো:

‘আখন্দ সাহেব চামার না হলেও এ লাইনে বেশ কড়া মক্কেল বলেই নাম। তাই আত্মীয় বলেই
যে উনি আপনাকে একেবারেই মাফ করে দেবেন এ কথা কখনো ভাবিনি।’

চেরাগ আলী লাকশার সাইজ রথম্যানের একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে উত্তর
দিলো,

না ঠিক সে কারণে উনি মাফ করেননি।

তবে?

এবার কোরবানউদ্দিন ওর ভাষা বুঝতে পারলো না। চেরাগ পকেট হতে একটা শাদা খাম বের করে কোরবানউদ্দিনের হাতে দিতে দিতে বললো, এই চিঠিটা পড়লেই বুঝবেন। কিন্তু এক শর্তে। চিঠিটা আজ ঠিক চারটের সময়ে লেডিজ কলেজে মিস জরিনা আখন্দের কাছে আপনি পৌছে দেবার ব্যবস্থা করবেন। আমি আর ঘন্টা খানেকের মধ্যেই ঢাকা রওয়ানা হচ্ছি।

দ্রুত হাতে কোরবানউদ্দিন চিঠিটি খুললো। সম্বোধনবিহীন একটি চিঠি। কয়েকটি মাত্র লাইন তাতে।

আমি ব্রিফলেস ব্যারিস্টার। বিস্ত্র কম। তাই তোমার আমার দু'দিনের নিভৃত মুহূর্তগুলোকেই ঘুম দিলাম তোমার বাবাকে। আশা করি ক্ষমা করবে।

BanglaBook.org

বুঝলে মোবারক-আগে লোকে বলতো ঠগ্ বাছতে গাঁ উঝাড় অথবা লোম বাছতে কঞ্চল শেষ।
আর এখন -?

এই পর্যন্ত বলে থামলেন চৌধুরী গোলাম মওলা। ঘরে আর যারা উপস্থিত ছিলেন তারা অপেক্ষা করতে লাগলেন মওলার হস্তধৃত ছইকির গ্লাসটা ঠোট হতে টেবিলের ওপর নেমে আসার জন্যে। মওলা লম্বা একটা চুমুক দিলেন। গিললেন। তারপর কথাটা শেষ করলেন।

আর এখন? আর এখন লোকে বলে সিএসপি বাছতে সেক্রেটারিয়েট খালি।

হা-হা করে হেসে উঠলেন চৌধুরী গোলাম মওলা, সিএসপি। তার এই রসিকতায় অন্য কেউ হাসলেন না। ধনবান ব্যবসায়ী কুদরৎ ইলাহির ধানমণ্ডির এই বিলাসবহুল এবং অতীব আরামদায়ক লাউঞ্জে বসে নিঃশব্দে ভারাক্রান্ত চিত্তে ধূম এবং মদ্যপান করে চলেছিলেন কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারি, ব্যবস্থায়ী এবং প্রোফেশনাল ব্যক্তি। চৌধুরী গোলাম মওলাই এই আসরের আয়োজন করবার আইডিয়াটা দিয়েছিলেন বন্ধু ব্যবসায়ী কুদরৎ ইলাহিকে আজ সকালে।

কুদরৎ ইলাহি তারপর ফোন করেছিলেন তাদের উভয়ের পরিচিত মহলে। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার পর হতে নানা মডেলের গাড়ি এসে জমে গেলো তার বাড়ির সামনে। কিন্তু ইলাহি আয়োজন যতাজনের জন্যে করেছিলেন তার মাত্র অর্ধেক এসে উপস্থিত হলেন। মওলা অবিশ্যি আগেই এসেছিলেন। সবাই উপস্থিত না হওয়াতে মওলা নিরুৎসাহিত হননি। ক্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের প্রথম বোতলটা খুলতে খুলতে তিনি বলেছিলেন :

নেভার মাইন্ড। শেষ পর্যন্ত উই শ্যাল অল মিট টুগেদার। পালিয়ে যাবে কোথায়?

তারপর সেই তখন হতেই চৌধুরী গোলাম মওলা বলে চলেছেন কথা অনর্গল। এঁতে চলেছেন ছইকি অবিরত। কিন্তু তিনি কখনো মাতাল হন না। আজো হননি। যদিও আজ তার আচরণ বেপরোয়া, উদ্ধত।

তার কারণ বোঝা মোটেই কষ্ট সাধ্য নয়। সি. জি. মওলার নাম শ্রুত কয়েক মাস ধরে ঢাকার সর্ব মহলেই উচ্চারিত হয়েছে। বিশেষ করে আটাশে নভেম্বরে প্রেসিডেন্টের বক্তৃতার পরে। মাসখানেক ধরে যেটা গুজব ছিলো, প্রেসিডেন্ট তার বক্তৃতায় সেটা সত্যে পরিণত করেছেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন দুর্নীতিপরায়ণ সরকারি কর্মচারীদের চাকরি হতে অপসারিত করা হবে এবং সমুচিত শাস্তি বিধান করা হবে। এই বক্তৃতার পর সি. জি. মওলা আরো বিখ্যাত হয়েছেন। সবাই ধরে নিয়েছেন ই. পি. সি. আই. ডি. সি.-র অন্যতম ডিরেক্টর মওলা বরখাস্ত হবেন। ইস্ট পাকিস্তান কাউন্সিল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান গোবর শিল্প উন্নয়ন সংস্থার ব্যর্থতার ইতিহাস কারুরই অবিদিত ছিলো না। এজন্যে সবাই দাবি করতেন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এবং ডিরেক্টরদের দুর্নীতি এবং অক্ষমতাকে। অবশ্য তার মানে এই নয় যে কর্পোরেশনের নিম্নমানের কর্মচারিরা সবাই সং ছিলেন। কিন্তু তাদের অসাধুতা ক্ষমা করা হতো এই বলে যে বড়ো সাহেবই যদি ঠিক না হবেন তবে ছোট সাহেবরা ঠিক থাকবেন কি করে। সুতরাং মার্শাল ল' হবার পর যখন সবার আয় ব্যয় এবং বিষয় আশয়ের হিসেব চাওয়া হলো তখন হতেই কর্পোরেশনের বড়ো

সাহেবদের নিয়ে গুজব চলেছে। তখন অন্যান্য আরো কয়েকজনের সঙ্গে চৌধুরী গোলাম মওলার নাম মুখে মুখে ঘুরেছে।

মওলা তার এই আকস্মিক খ্যাতিতে প্রথমে বিচলিত হলেও পরে সামলে নিয়েছিলেন। স্থির করেছিলেন অবধারিত পরিণতির সঙ্গে সাহসের সাথে মুখোমুখি হবার। বিশ্বাস করেছিলেন নেহায়েতই যদি গুজব সত্যে পরিণত হয় তবে তার প্রীতিধন্য ব্যবসায়ী বন্ধুরা বিপদের দিনে পাশে এসে দাঁড়াবেন। কুদরৎ ইলাহি তো বহু বছর ধরেই তাকে চাকরি ছেড়ে ব্যবসায়ে যোগ দিতে উপদেশ দিচ্ছিলেন। শুধু ইলাহি কেন? মওলার সাহায্য লাভ আরো অনেকেই করেছিলেন।

সুতরাং মওলা গত কয়েক দিনে একটা ডোন্ট কেয়ার ভাব নিয়ে চলাফেরা করেছেন।

চিয়ার আপ মোবারক। লেটস অল গু টু হেল টুগেদার।

মওলা আরো হইকি ঢালতে ঢালতে বললেন। মোবারক তরফদার সেভেন আপ খাচ্ছিলেন। টেবিলের ওপর গোল্ড লিফ, প্রিন্সিপালস এবং ফাইভ ফিফটি ফাইভের প্যাকেটগুলো পড়েছিলো। তিনি একটা ফাইভ ফিফটি ফাইভ টেনে বের করলেন। মওলা উঠে এসে মোবারকের ঘাড়ের ধাক্কা দিলেন।

চিয়ার আপ ম্যান। চিয়ার আপ। হ্যাভ সাম গোল্ডেন স্টার।

মওলা হইকির বোতলের দিকে হাত বাড়ালেন।

নো, থ্যাঙ্কস। অন্যমনস্কভাবে মোবারক উত্তর দিলেন।

আওয়ার ফ্রেন্ড ইস এ বিট আপসেট টুনাইট।

মওলা হাসতে হাসতে অন্যদিকে চলে গেলেন।

হিয়ার ইস সোডা।

ব্যারিস্টার শাহাব খান মওলাকে ডাকলো।

নো। আই প্রেফার ওয়াটার। ইয়োর ড্যাম সোডা রুইনস স্কচ।

হ্যাভ ইউ এভার ট্রায়েড ইউ?

ব্যারিস্টার তর্কের সূত্রপাত করলো। মওলা ব্যস্ত হয়ে গেলেন। কুদরৎ ইলাহির ব্যবস্থা সূচারু এবং গ্লাস খালি যাচ্ছিলো না। অতিথি পরায়ণতায় তিনি সিদ্ধান্ত নিন্তেন। কুদরৎ ইলাহির ব্যবসায়ে উন্নতির অন্যতম মূল কারণ তার এই গুণ। তার এই লাউঞ্জ প্রতি সপ্তাহেই ছোটবড়ো পার্টি হতো। গত কয়েক সপ্তাহ অবশ্য মন্দা গেছে। সিএসপিদের চাকরি হতে ডিসমিস হবার গুজবটা চালু হবার পর হতেই এই অবস্থা। ইলাহি এ কদিন কাউকে মদ খেতে উৎসাহ দিতে সাহস করেননি। সন্ধ্যার পর একাই গ্লাস নিয়ে বসেছেন। বিরক্ত হয়েছেন। একা মদ খেয়ে তিনি কোনোদিন সুখ পাননি। সুতরাং আজ সকালে ফোনে মওলার প্রস্তাব পাওয়া মাত্রই তিনি অতি উৎসাহিত হয়ে এই পার্টির ব্যবস্থা করেছিলেন। তার লাউঞ্জে প্রাণ ফিরে আসার জন্যে মওলার প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা বোধ করছিলেন। ভাবছিলেন মওলার উদ্যম ইপিসিআইডিসিতে কিভাবে অপচয় হচ্ছে। কলিং বেল টিপে ভৃত্যকে তিনি ফ্রিজ হতে আরো কয়েকটি সেভেন আপের ঠাণ্ডা বোতল এবং বরফ নিয়ে আসতে বললেন।

পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন আরো যারা তাদের মধ্যে কেউ ব্যালকে কেউ বিদেশী কম্পানিতে কাজ করেন। কেউবা ব্যবসায়ে। কেউবা ইনশিওরেন্সে। ওদের সবাইকে মোবারক তরফদার ভালো

করেই চেনেন। ওরা আসবে জেনেই তিনি ওদের সঙ্গে আজ সন্ধ্যায় যোগ দিতে পারছিলেন না। সাধারণত এমন পার্টিতে তিনি একটু আধটু মদ খেয়ে থাকেন। কিন্তু আজ তার মদে রুচি হয়নি। অল্প অল্প করে সেভেন আপ খাচ্ছিলেন এবং ভাবছিলেন নিজের অতীত এবং ভবিষ্যৎ।

তিনি ভাবছিলেন কেননা তিনিও একজন সিএসপি। এখন সেক্রেটারিয়েটে। মোবারক তরফদার যে দুর্নীতিপরায়ণ এমন কথা শোনা যায়নি। কিন্তু তবুও তার মানসিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো চৌধুরী গোলাম মণ্ডলার প্রায় বিপরীত। এই ক'দিনে ভয়ে এবং চিন্তায় কয়েক পাউন্ড ওজন হয়তো তার কমেছে। দিনে তার স্বপ্তি হয়নি। রাতেও তার সুনিদ্রা হয়নি। তার এ ধরনের প্রতিক্রিয়া হবার মেলা কারণের মধ্যে সর্বপ্রধান যেটি সেটি হচ্ছে তার কন্যা রুবীর প্রস্তাবিত বিয়ে।

রুবী তার প্রথম সন্তান এবং একমাত্র কন্যা। বয়েস তার সতেরো। আদরিনী রুবীর বিয়ে মোবারক তরফদার অতি অল্প বয়সেই দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। কারণ তিনি একটি ভালো পাত্র পেয়ে গিয়েছিলেন। পাত্র আজমল আলী বিলেত হতে সদ্য ফিরেছে। কষ্ট অ্যাকাউন্টেন্ট। এসেই হাজার আড়াই টাকার চাকরি পেয়েছে বিদেশী তেলের কম্পানিতে। পাত্রের দোষের মধ্যে এই যে বয়স তার তিরিশ। বিলেতে পরীক্ষায় বেশ কয়েক দফা ফেল করায় বয়সটা বেড়ে গিয়েছিলো। কিন্তু এই খুঁটুকু বাদ দিলে এমন গুণধর পাত্র পাওয়া সত্যিই সৌভাগ্যের বিষয়। পাত্রের অনেক গুণের মধ্যে যে গুণটি মোবারক তরফদারকে সর্বাধিক মুগ্ধ করেছিলো তা হচ্ছে বিয়েতে দাবি দাওয়ায় তার অসম্মতি। ঘটক মুকাদ্দস আহম্মদ বলেছিলো :

বুঝলেন তরফদার সাহেব। ছেলে বহুদিন বিলেতে থেকে প্রোগ্রেসিভ হয়ে ফিরেছে। সে এই বিয়েতে কিছুই চায় না। শুধু আপনার মেয়ে রুবীকে।

আহা! তবুও অন্তত কিছু ফার্নিচার -

না। না। কিছু না। ফার্নিচার থেকে শুরু করে ক্রকারি পর্যন্ত কম্পানি ওকে দিয়েছে। একেবারে অলফাউন্ড চাকরি। শুধু ওয়াইফ দিতে পারে না। নইলে এই কম্পানি তাও দিতো।

তাহলে বিয়েটা অন্তত ঘটা করে হোক। ইন্টারকন্টিনেন্টালের বলরুম -

ওসব কিছুতেই ছেলে রাজি হবে না। বিলেতে কি আর হোটেল খেতে বাকি রেখেছে? এখন চটপট একটা বিয়ে করে সেটলড হয়ে যেতে চায় ও। লেডিস রুমই রিসেপশন দিলে চলবে। সত্যিই, এমন ছেলে দেশের গৌরব।

মরণচাঁদের একটা সন্দেশ মুখে দিতে দিতে মুকাদ্দস আহম্মদ বলেছিলেন কথাটা। মোবারক অগ্রিম টিকেট কেনার মতোই অগ্রিম গৌরব বোধ করেছিলেন। তিনি জানতেন তার মেয়ে সুন্দরী বলে নাম করেছে এবং তার ভবিষ্যত জামাই আজমল প্রধানত এই কারণেই রুবীকে বিয়ে করতে চেয়েছে। তবুও এমন নিঃস্বার্থপর ছেলে আজকাল বিরল। কৃতজ্ঞতা বোধ করেছিলেন মুকাদ্দস আহম্মদের প্রতি। তারই চেষ্টায় এই বিয়েটা হতে চলেছে। মুকাদ্দস আহম্মদের পুরনো রিস্টোরাঁটির দিকে তাকিয়ে স্থির করেছিলেন বিয়েটা হয়ে গেলে ওকে একটি ভালো ঘড়ি উপহার দেবেন। মুকাদ্দস তার দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়। কিন্তু কটা আত্মীয় এমন উপকার করতে এগিয়ে আসে?

কিন্তু ওই পর্যন্তই। এরপর সরকারি কর্মচারীদের নিয়ে সেই গুজবে শহর মুখরিত হয়ে উঠলো। মুকাদ্দস আহম্মদ হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তার অফিস এবং বাড়িতে দুবেলা ফোন করে করে মোবারক তরফদার হুঁদ হয়ে গেলেন। ক্রমশই যে শংকা তার মনে ভিৎ পেড়ে বসছিলো সেটি আজ বিকেলে সত্যে পরিণত হলো।

আজ বিকেলে বিনা নোটিশে মুকাদ্দস এসেছিলেন বাড়িতে। এসে মাফ চেয়েছিলেন তিনি। আমাদের ইনশিওরেন্স কম্পানি মফঃস্বলে নতুন কয়েকটা ব্রাঞ্চ খুলেছে তাই ব্যস্ত ছিলাম একটু। ডেভেলপমেন্ট অফিসার মুকাদ্দস স্বীয় ক্রটি লাঘবের চেষ্টা করলেন প্রথমে। তারপর তিনি চা খেতে খেতে চললেন :

বুঝলেন তরফদার সাহেব। আমাদের দেশে একটা কথা চলিত আছে। সেটা হলো অন্ধকার ঘরে সাপ, সারা ঘরে সাপ!

তার মানে?

মোবারক তরফদার সত্যিই বুঝতে পারলেন না।

বুঝলেন না? কয়েকটা সিএসপি'র চাকরি যাবে কিন্তু সব সিএসপিকেই এখন লোকে সন্দেহ করছে। যতোক্ষণ না নামগুলো জানা যাচ্ছে ততোক্ষণ আপনাদের সবাই এক অবস্থা।

অত্যন্ত নিষ্ঠুর শোনালো মুকাদ্দাসের কথা। কিন্তু মোবারক প্রতিবাদ করতে পারলেন না। তিনি নিজেও জানেন না তার চাকরি থাকছে কি থাকছে না। চাকরিতে বড়ো দাঁও কখনো তিনি মারেননি। কিন্তু এখানে গুথানে মাঝে মাঝে ফ্রি মদ খেয়েছেন। আর সেখানে যখন বেশ্যা আনা হয়েছে তখন তাদের গা একটু টেপাটেপি করেছেন। তার বেশি আর সাহস হয়নি। মুকাদ্দস সিগারেট টানতে টানতে আরো বলছিলেন :

গুজবের আর শেষ নেই! কোথাও গুলি দেড়শো, আর কোথাও গুলি পাঁচশো অফিসারের চাকরি যাবে। শুধু ঘুষের জন্যে নয়, অফিসের পিয়ন, ড্রাইভারকে বাড়িতে খাটোনো, নিজের লোককে চাকরি দেওয়া, অফিসে পক্ষপাতিত্ব এসবের যে কোনো একটার জন্যেই চাকরি চলে যাবে। তা এ রকম একটু আধুটু ক্ষমতার অপব্যবহার করেননি এমন সরকারি কর্মচারী কি আছেন? কথা হচ্ছে এখন কার নামে খবর গেছে, আর কার নামে যায়নি। কে ধরা পড়বে আর কে ধরা পড়বে না। এসব না জানা পর্যন্ত বিয়ের ব্যাপারে না এগুনোই কি মঙ্গল হতো না?

হ্যাঁ। তা তো বটেই। সায় দিতে চাইলেন মোবারক তরফদার।

আজমলের বাপের বেশ নাম ছিলো ঘুষখোর। সেইসঙ্গে তার মতো এক ছোটো অফিসারের পক্ষে ছেলেকে বিলাতে পড়ানো সম্ভব হতো না। কিন্তু আপনি তো জানেনই আজমল কি রকম খাঁটি ছেলে। বাপের যাই নাম থাকুক না কেন শ্বশুরের কোনো বদনাম সে চায় না। তাই দুই একদিন অপেক্ষা করে বিয়ের তারিখ ঠিক করবার কথা বলছিলাম আর কি।

অ্যাশট্রেতে সিগারেটটা থেংলে দিলেন মুকাদ্দস।

আশ্চর্য।

এমন দিন যে আসতে পারে সে কি কখনো ভেবেছিলেন মোবারক তরফদার? সিএসপি যেদিন হয়েছিলেন সেদিন থেকেই নাম, ক্ষমতা এবং নিরাপত্তার অবিসংবাদি মালিক হয়েছিলেন।

কিন্তু আজ কি দুর্দিন?

নামের পরিবর্তে বদনামের ভাগীদার হয়েছেন।

ক্ষমতাচ্যুতির দিন প্রায় আসন্ন।

নিরাপত্তা এখন এক অলীক স্বপ্ন।

অসহ্য এই শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতি।

নামাজ পড়ার কথা ভাবলেন তিনি।

কেবল মাত্র ঈশ্বরই বোধ হয় তাকে মুক্তি দিতে পারেন।

পাশের ঘর থেকে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ আসছিলো।

মোবারক সে ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন তার বৃদ্ধ মা বিছানায় বসে কাঁদছেন নাতনীর বিয়ে ভেঙে যাবার শংকায়। এতো অমঙ্গল দেখে তিনি কবরে যাবেন কি করে? মোবারকের স্ত্রী তাকে নিষ্ফল আশ্বাসবাণী শোনাচ্ছিলেন। রুবীও পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো চুপ করে। পিতাকে দেখে নত চোখে ঘর হতে বেরিয়ে গেলো সে।

মিসেস মোবারক হঠাৎ গর্জে উঠলেন।

তুমিই দাও না কেন এ বিয়ে ভেঙ্গে? এমন ছেলে কি আর দেশে একটাও নেই? কিংবা হবে না? আরেকবার তাকিয়ে দ্যাখো মেয়ের দিকে। অমন চেহারার মেয়েকে কে কটা পেটে ধরেছে? অ্যা? রুবীর বিয়ে কোনোদিনো আটকাবে না। ঢের ঢের অ্যাকাউন্টেন্ট পাওয়া যাবে। মেয়েটা পড়াশোনা করতে চায় এতো। পড়ুক সে আরো ...

মিসেস তরফদার হয়তো আরো বলে চলতেন। কিন্তু শাশুড়ির কান্নাও তার কথার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছিলো এবং শেষ পর্যন্ত ঘরে উচ্ছ্বাসের কান্না ছাড়া আর কিছু শোনা সম্ভব হচ্ছিলো না।

এসব ঘটছিলো কুদরত ইলাহির সন্ধ্যার এই পার্টিতে আসার অব্যবহিত পূর্বে।

বলাবাহুল্য এমন মানসিক অবস্থা নিয়ে মোবারক তরফদার পার্টির কোনো আলোচনায় যোগ দিতে পারছিলেন না। সেভেন আপ খেতে খেতে তিনি তাই নিজে অতীত এবং ভবিষ্যৎ ভাবছিলেন। বিশ্লেষণ করছিলেন দেশের বর্তমান পরিস্থিতি।

ঘরের এক কোণায় রাখা টেলিফোনটা হঠাৎ বেজে উঠলো। কুদরত ইলাহি এগিয়ে ফোনটি ধরলেন। তারপর ডাকলেন মিঃ শরিয়তউল্লাহকে। মিনিট দুটো ফোনে কথা বলে মিঃ শরিয়তউল্লাহ উত্তেজিতভাবে ঘরের কেন্দ্র স্থলে ফিরে এলেন।

লেটেস্ট খবর আছে। পিণ্ডি থেকে এক স্পেশাল ক্যাবিনেট সেক্রেটারি এসেছেন ইস্ট পাকিস্তানের লিষ্ট নিয়ে। প্রথমে গভর্নর আর পরে চিফ সেক্রেটারিকে সে লিষ্ট দেখানো হয়েছে। লিষ্টে যাদের নাম আছে কাল থেকে তাদের কাছে পার্সোনেলি চিঠি ডেলিভারি করা হবে।

চিঠিতে কি লেখা আছে শুনেছো কিছু? চৌধুরী গোলাম মওলা আরেক বোতল হইকি খুলতে খুলতে জিজ্ঞাসা করলেন।

চিঠিতে ওদের চাকরি হতে সাসপেন্ড করা হয়েছে এবং কেন ডিসমিস করা হবে না তার কারণ দর্শাতে সাতদিনের সময় দেওয়া হয়েছে।

কজন গেলো? মওলা গ্লাসে হইকি ঢাললেন।

তিনশো তিন শুনলাম। উনচল্লিশজন সিএসপি ইনব্লুডেড। শরিয়তুল্লাহ তার শূন্য গ্লাসটা মণ্ডলার দিকে এগিয়ে দিলেন।

কারুর নাম শুনলে? কুদরত ইলাহি প্রশ্ন করলেন।

নাঃ। তবে আগামী কাল বিকেলের মধ্যেই সব সাসপেন্স ওভার হয়ে যাবে। সব চিঠি এই সময়ের মধ্যে বিলি হয়ে যাবে শুনলাম। আরো টোয়েন্টি ফোর অ্যাপোনাইজিং আওয়ার্স!

শরিয়তুল্লাহ খবর প্রদান করলেন। মণ্ডলা আবার হা হা করে হেসে উঠলেন।

টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স বলছে কি হে? আমাদের মোবারককে দ্যাখো। মনে হবে টোয়েন্টি ফোর ইয়ার্স ধরে সে যাতনায় ভুগছে। ফর ক্রাইস্টস সেক মোবারক। গেট এ স্কচ। লেটস হ্যাভ লাস্ট ড্রিংক।

তার পর দিন জানা গেলো নামগুলো। মোবারক তরফদার অফিসের কাজে মন দিতে পারছিলেন না। দুচারটে চিঠি ডিষ্টেট করলেন। কয়েকবার শরিয়তুল্লাহকে ফোন করলেন। কিন্তু প্রতিবারই শরিয়তুল্লাহর লাইন এনগেজড পেলেন।

শরিয়তুল্লাহ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর। কিন্তু ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরের যা প্রাপ্যমূল্য তার চাইতেও তিনি বেশি পেতেন এই জন্যে যে সরকারি এবং বেসরকারি মহলের গুরুত্বপূর্ণ সর্বশেষ সঠিক সংবাদ তার কাছে সব সময়ই পাওয়া যেতো। শরিয়তুল্লাহ নিজেকে সেরা 'ওয়ান ম্যান নিউজ এজেন্সী' বলে দাবি করতেন। সুতরাং মোবারক তরফদার সকাল হতেই চেষ্টা করেছেন শরিয়তুল্লাহর সঙ্গে কথা বলবার।

এগারোটার দিকে তিনি শরিয়তুল্লাহকে পেলেন। যে কয়েকটি সাসপেন্ডেড সরকারি কর্মচারির নাম শুনলেন তার মধ্যে চৌধুরী গোলাম মণ্ডলা আছেন। মণ্ডলা আজ আর তার অফিসে যাননি। কোনো দিনও আর যেতে হবে না। গুজব তাহলে সত্যে পরিণত হলো। তবু নিজের খবর শরিয়তুল্লাহ দিতে পারলো না। বললো পরে ফোন করে জানাবে। ফোন ছেড়ে দিয়ে সামনের দেয়ালটির দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবছিলেন মোবারক তরফদার। এতদিনের পড়াশোনা, পরীক্ষা, ট্রেনিং সব কিছু নিরর্থক হয়ে গেলো মণ্ডলার।

এরপর সমাজে ওঠা বসা কি করে করবে সে? সেই বেশ্যাগুলোর মতো নির্লজ্জ হতে হবে। কলংকের জীবন্ত বিজ্ঞাপন হয়ে কালাতিপাত করতে হবে।

চাপরাশি মাঝখানে এসে একটা ভিজিটিং কার্ড দিয়ে গিয়েছিলো। ইঠাং লক্ষ্য করলেন মোবারক কার্ডের নামটি। জাপানি ব্যবসায়ী মিঃ সুকিতা তার দর্শন প্রার্থী। ইতিপূর্বে জাপান থেকে মিঃ সুকিতা মোবারকের জন্যে টেপ রেকর্ডার, রেডিও এবং হংকং থেকে দুচারটে কাপড় চোপড় আনিয়ে দিয়েছেন। মাস খানেক আগে যখন রুবীর বিয়ের কথা চলছিলো তখন মোবারক শুনেছিলেন মিঃ সুকিতা দিন কয়েকের জন্যে টোকিও যাবেন। তিনিই ফোন করে মিঃ সুকিতাকে বলেছিলেন টোকিও যাবার আগে তার সঙ্গে দেখা করে যাবার জন্যে। ইচ্ছে ছিলো রুবী আর জামাইয়ের জন্যে কিছু আনাবেন মিঃ সুকিতাকে দিয়ে। মোবারক তরফদার চাপরাশিকে ডেকে তাড়াতাড়ি ভদ্রলোককে পাঠিয়ে দিতে বললেন।

স্বল্প আকৃতির মিঃ সুকিতা পেটেন্ট জাপানি হাসি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। চোখে তার চশমা।

পরাণে ঢিলেঢালা স্যুট। হাতের চারকোণা কালো ব্যাগটা চেয়ারের পাশে নামিয়ে রাখলেন।

মিঃ সুকিতা জানালেন যে তিনি আগামীকাল পার্ল রুটে টোকিও যাচ্ছেন।

মিঃ তরফদারের কি প্রয়োজন তা জানলে বাধিত হবেন। কিন্তু মিঃ সুকিতাকে আশ্চর্য করে দিয়ে মোবারক জানালেন যে এ যাত্রা তার কোনো প্রয়োজন নেই। টোকিও থেকে কিছুই আনতে হবে না।

মিঃ সুকিতা তবুও খুবই পীড়াপীড়ি করলেন। বললেন যে প্রতিবার টোকিও যাবার সময় তিনি এতো ফরমালেশ পান যে একটা জাহাজ ভরে জিনিস আনতে হয়। অথচ এবার কেউই তেমন কিছু বলছেন না। মিঃ সুকিতা শেষ চেষ্টা করে বললেন যে তিনি নিজের পক্ষ হতে মিঃ তরফদারের মেয়েকে বিয়েতে একটা উপহার দিতে চান এবং সেই উপহার আনবার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু মোবারক তবু অটল রইলেন। বললেন বিয়েটা ভেঙ্গেও যেতে পারে। মিঃ সুকিতা বললেন :

এভরিথিং উইল বি অল রাইট মিঃ তরফদার। জাস্ট সে ইনশাআল্লাহ।

মিঃ সুকিতার বলার প্রয়োজন ছিলো না। মোবারক তরফদার ইতিমধ্যে বহবার ঈশ্বরের নাম নিয়েছেন। চলে যাবার আগে মিঃ সুকিতা বলে গেলেন, আই উইল সি ইউ এগেন বিফোর আই গো। ইনশাআল্লাহ।

মিঃ সুকিতা চলে গেলেন।

কিন্তু তার আশ্বাসবাণী মিথ্যে হলো না।

বেলা একটার দিকে মিঃ শরিয়তউল্লাহ ফোন করলেন। বিশ্বস্ত সূত্রে তিনি জেনেছেন মোবারক তরফদারের নাম লিস্টে নেই। এ যাত্রা তিনি বেঁচে গিয়েছেন। সন্ধ্যায় কুদরৎ ইলাহির বাড়িতে উপস্থিত হবার অনুরোধ জানিয়ে শরিয়তউল্লাহ ফোন ছেড়ে দিলেন।

মোবারক তরফদার হস্তধৃত কালো ফোনটির দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। জীবনে এতো বড়ো সুসংবাদ তিনি কখনো পেয়েছেন বলে মনে হলো না। উত্থান এবং পতনের মধ্যে আসলে বেশি ফাঁক আছে কি? এই ফোনে এমনও সংবাদ আসতে পারতো যে তার চাকরি গিয়েছে। কিন্তু তা হয়নি। আর হয়তো হবে না। মোবারকের ঠোঁটে হাসির চিহ্ন দেখা দিলো। তারপর সেই চিহ্ন শব্দ ধারণ করলো। মোবারক উচুস্বরে হাসতে লাগলেন। ঘরময় তার হাসি ফেটে পড়তে লাগলো।

উন্মাদের মতো সেই হাসি শুনে চাপরাশি সভয়ে দরজায় উকি দিলো। মোবারক কোনো রকমে হাসি সংবরণ করে বললেন ড্রাইভারকে গাড়িতে পাঠানোর জন্যে। তিনি এখনি বাড়ি যাবেন।

সেদিন সন্ধ্যায় আবার নানা রংয়ের কয়েকটি পার্টি এলোমেলোভাবে পার্ক করলো কুদরৎ ইলাহির সেই বাড়ির সামনে। আরোহীবৃন্দ সমবেত হলেন ইলাহির সেই বিলাসবহুল ড্রয়িং রুমে। তুলে নিলেন হইকির গ্লাস। খুলে দিলেন সংখ্যার বাঁধ। শরিয়তউল্লাহ একটি উর্দুভাষী বেশ্যা সঙ্গে এনেছিলেন। মোটামুটিভাবে সুশ্রী এবং সুবেশা ছরবানু। যদিও সে মুক হয়ে বসেছিলো তবুও একটি নারীর উপস্থিতি পরিবেশে সঞ্চার করেছিলো অধিকতর মাদকতা। আর সেখানে সর্বাধিক প্রাণবন্ত ছিলেন মোবারক তরফদার। হইকি আর হাসি তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো।

সেই পার্টিতে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অতিথি ছিলেন মিঃ সুকিতা। সুদরৎ ইলাহি তাকে ডেকেছিলেন।

আর অনুপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন চৌধুরী গোলাম মওলা। কুদরৎ ইলাহি তাকে ডাকেননি। কিন্তু তিনি বলছিলেন :

আই মাস্ট সে হি হ্যাজ ফেসড দি সিচুয়েশন তেরি ব্রেভলি।

এখন কোথায় সে? ব্যারিস্টার শাহাব খান প্রশ্ন করলো।

নর্মাল টাইমে যার এতো এনার্জি এখন নর্মাল টাইমে তার কতো এনার্জি হতে পারে ভেবে দেখ।
গুণমুগ্ধ ইলাহি একটি অস্পষ্ট উত্তর দিলেন।

টু হেল উইথ ইউ। জাস্ট টেল মি হোয়ার মওলা ইজ। ঠকাস করে টেবিলে গ্রাস নামিয়ে রাখলো বিরক্ত শাহাব খান।

সব পলিটিকাল লিডারদের বাড়ি দৌড়াদৌড়ি করছে। এখন কেবল লেটার অফ সাসপেনশন পেয়েছে। চার্জশিট ইস্ত হবার আগে যদি তদবির করে কিছু করা যায়। আই অ্যাম শিয়োর শাহাব— এ ম্যান লাইক মওলা উইল ডেফিনেটলি কাম আউট অফ দিস ফায়ার অ্যাবসলিউটলি আনহার্ট। দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ইলাহি তার মত ব্যক্ত করলেন।

উত্তরে শাহাব কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ একটি গ্রাস ভাস্কর শব্দে ফিরে তাকালেন সবাই মোবারকের দিকে। তারই হাত হতে গ্রাস কখন খসে পড়ে গিয়েছে সে খেয়াল তার নেই।

হরবানু যে সোফায় বসে সেখানে তিনি জুতো পায়ে উঠে পড়েছেন। এলোমেলা হাতে তিনি হরবানুকে সোফাতে শুইয়ে ফেলার চেষ্টা করছিলেন। হরবানু ওকে ঠেলে সরিয়ে দেবার দুর্বল প্রচেষ্টা করছিলো। মোবারকের চোখ লাল। খুঁতনিতে লাল। শার্টের কলার খোলা। কোমরের একদিকে গেঞ্জি বেরিয়ে এসেছে।

মিঃ সুকিতা দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলেন মোবারকের দিকে।

হ্যালো। হ্যালো। মাই জাপানিস ফ্রেন্ড।

মোবারকের সম্ভাষণে মিঃ সুকিতা দাঁড়িয়ে পড়লেন। ওকে হঠাৎ দাঁড়াতে দেখে মোবারক হো হো করে হেসে উঠলেন।

ইউ থিংক আই অ্যাম ড্রাংক? আই হ্যাভ নেভার বিন। ইউ নো সুকিতা? এভরিথিং ইস অলরাইট। ইভেন দা ম্যারেজ। ইউ ওয়ান্টেড টু গিভ সামথিং, ডিন্ট ইউ থিংক মি দ্যাট বিউটিফুল রিস্টওয়াচ অফ ইয়োস। আই নিড ইট।

মিঃ সুকিতা তার হাত হতে রিস্টওয়াচটি খুলে বাড়িয়ে দিলেন মোবারকের দিকে। মোবারক ছিনিয়ে নিয়ে সেটি পকেটস্থ করে বললেন :

থ্যাঙ্ক ইউ মাই জাপানিস ফ্রেন্ড।

তারপর তিনি আবার ব্যস্ত হয়ে গেলেন হরবানুকে নিয়ে। পাশের ঘরের দরজার কাছে মোবারক তাকে টেনে নিয়ে গেলেন। উপস্থিত সবাই গভীর কৌতূকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করছিলেন হরবানুর আর মোবারক তরফদারের ধস্তাধস্তি। মোবারক কিছুতেই দরজা খুলতে পারছিলেন না। বোতাম খোলা ট্রাউজার তার প্রায় খসে পড়তে চাইছে।

মিঃ শরিয়তউল্লাহ এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলেন। অন্ধকার ঘরে মোবারক হরবানুকে নিয়ে ঢুকে পড়লেন। শরিয়তউল্লাহ ধীরে দরজাটা বন্ধ করে ঘরের কেন্দ্রে ফিরে এলেন। গ্রাসে হইকি ঢেলে পানি মেশালেন।

বরফ ঢাললেন।

চুমুক দিলেন।

আর সবাই পূর্ব আলোচনায় ফিরে গেলেন। কিন্তু মিঃ সুকিতা পারলেন না।

তিনি এগিয়ে এলেন শরিয়তউল্লাহর কাছে।

ডিন্ট ইউ মাইন্ড?

নো। নট অ্যাট অল।

বাট হোয়াই নট?

হোয়াই শুড আই? ওরা যখন চায় তখন ওদের দিতে হয়—এটাই তো নিয়ম। তুমি যেমন তোমার রিস্টওয়াচটা দিলে।

আই ওয়াজ রাইট দেন। দে অল আর সেম।

হ্যাঁ মিঃ সুকিতা। তুমি ঠিকই বলেছো। ওরা সবাই এক। তাই শুধু ওদের বদলালেই চলবে না— দেশের সব নিয়মও বদলাতে হবে। নইলে সবই ঠিক চলবে আগের মতো।

আই থিঙ্ক ইউ আর রাইট দেয়ার।

ওয়েল। পারহ্যাপস। এনিওয়ে, আই অ্যাম নিদার এ ফিলসফার নর এ পলিটিশিয়ান। আই অ্যাম এ ব্যাংকার। অ্যান্ড টু নাইট আই অ্যাম এ ড্রিংকার। লেটস ড্রিংক।

দুজনার জন্যে গ্লাসে হইসিক ঢাললেন শরিয়তউল্লাহ।

গড়িয়ে চললো কুদরৎ ইলাহির পার্টি।

ঠিক আগের মতো।

অন্ধকার রাত্রির দিকে।

ঠিক যেভাবে গড়িয়ে চলেছে দিন—মাস—বছর এক অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে।

অপরিবর্তিত তার গতি।

অবধারিত তার পরিণতি।

BanglaBook.org

এতোক্ষণ ট্রাকটি ওদের পথ আটকে রেখেছিলো।
 সেই কাওরান বাজার লেভেল ক্রসিং হতে ফার্মগেট পর্যন্ত।
 মতলব পেছন থেকে একটানা হর্ন বাজিয়েছে।
 মুখ খিচিয়েছে।
 এবং সজোরে কতোগুলো ইঞ্জরেজি গালি দিয়েছে।
 কিন্তু 'বাস্টার্ড' ট্রাক ড্রাইভারটি একনিষ্ঠভাবে রাইট লেন দিয়েই ট্রাক চালিয়েছে।

মতলবের এই অসহায় অবস্থার দর্শকের দুটি শ্রেণী ছিলো।
 প্রথম শ্রেণীতে ছিলো ট্রাকের ওপর দাঁড়ানো লুন্ডি পরিহিত আরোহীবৃন্দ। মতলবের হর্নে ওরা
 হেসেছে। পানের পিক ফেলেছে। সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়েছে।
 মতলব বলেছে হাউ অফুল!
 আর দর্শকের দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিলো মতলবের পাশে আসীন রাজিয়া। রাজিয়াও হেসেছে।
 প্রশ্ন করেছে।

বাঁ দিক দিয়ে ওভারটেক করতে পারো না?
 পারি। কিন্তু ওটা ড্রাইভিংয়ের নীতি বিরোধী।
 নীতি না হাতি। আমি তোমার সিটে থাকলে কিছুতেই এতোক্ষণ ওই বিচ্ছিরি লোকগুলোর
 পেছনে থাকতাম না। আসলে বলো তুমি ওভারটেক করতে পারবো না।
 বেশ তো তহলে তুমিই এসো না কেন আমার সিটে।
 ইশ। আমি যেন কতো ড্রাইভিং জানি।
 জানো না যখন তখন চুপ করে থাকো।
 বিরক্ত হয়েছে মতলব রাজিয়ার উক্তি।
 খুশি হয়েছে রাজিয়া মতলবের বিরক্তিতে।

এই করছো কি? লোকজন মেরে ফেলবে যে।
 মতলব তার গাড়ি সজোরে বাঁয়ে ঘোরালো।
 এখন তার সামনে খোলা পথ।
 লোকজন নয়। তুমি। তুমি মরবে। ভয়ে।
 মোটেই না। দেখি তুমি কতো জোরে চালাতে পারো।
 মতলব কোনো উত্তর দিলো না।
 ইন্দরা রোড চওড়া এবং ওয়ান ওয়ে।
 তাছাড়া ট্রাফিক নেই বললেই চলে।
 ওর লাল মাৎসুদার বেগ বাড়তে লাগলো দ্রুত।

বাস, রিকশা, স্কুটার সব ওভারটেক করে যেতে লাগলো সে।
সেকেন্ড ক্যাপিটালের রাউন্ড অ্যাবাউটে এসে গতি একটু কমিয়ে আনলো সে।
কিচকিচ শব্দ করে গাড়ি ঘুরলো মোহাম্মদপুরের দিকে।
এবার সামনে আরো খোলা এবং চওড়া পথ।
অ্যাকসিলারেটর পুরো চেপে দিলো মতলব।
স্পিডোমিটারের কাঁটা লাফিয়ে উঠলো ষাটে।

উঃ! কি মজা। আরো জোরে চলো না কেন?
রাজিয়ার প্রশ্ন বাতাসের শব্দে হারিয়ে গেলো।
গাড়ি এসে থামলো মীরপুর রোডের মোড়ে।
মতলবকে একটু থামতে হলো।
মীরপুর রোডে গাড়ি চলাচল বেশি।
কেমন লাগলো।
দারুণ।

ঢাকায় ওরকম পথ ওটুকুই। নইলে –
নইলে কি?

নইলে আরো জোরে যেতাম। অনেক অনেকক্ষণ।
তাতে কি, ওই পথেই কয়েকবার আপ অ্যান্ড ডাউন করলে হয়।
বাঃ। একটু নতুন আইডিয়া দিয়েছো। একদিন তাই করবো।
একদিন কেন? আজই করো না কেন?
বেশ। তাই হোক।

মতলব গাড়ি সেকেন্ড ক্যাপিটালের রাউন্ড অ্যাবাউটের দিকে ঘোরালো।
সত্যিই তোমার ফাস্ট ড্রাইভিং এতো ভালো লাগে?
সত্যি না তো কি?
তাহলে তোমার বিদেশে জন্ম হওয়া উচিত ছিলো।
কি হতো তাহলে?

কি আর হতো। হাইওয়েতে দেদার ফাস্ট ড্রাইভ করলে পারতে।
গাড়ি সেকেন্ড ক্যাপিটালের রাউন্ড অ্যাবাউটে এসে গেলো।

এই শোনো না। এই রাউন্ড অ্যাবাউটটার চারপাশে কিছুক্ষণ চরকি কাটো না। রাজিয়ার অদ্ভুত
অনুরোধে মতলব অবাক না হয়ে পারলো না।

বেশ।

মতলব বার পাঁচেক রাউন্ড অ্যাবাউটের চারপাশে ঘুরলো।

ভারি ভালো লাগছে। ছোটবেলায় একটা বটগাছের নিচে এমনিভাবে ঘুরতাম আর ঘুরতাম।
রাজিয়া বললো।

এখন চলো। যদিকে যাচ্ছিলাম সেদিকে।

মতলব আবার মীরপুর রোডের দিকে চললো।

তোমার টেপটা বাজাও না কেন?

মতলব ন্যাশনাল স্টিরিওর বাটন টিপলো।

গাড়িতে হার্ব অ্যালপার্ট আর টিউয়ানা ব্রাসব্যান্ডের ট্রামপেট বাজতে থাকলো।

একটু শোনার পর রাজিয়া প্রশ্ন করলো :

নতুন আর কোনো টেপ নেই তোমার?

আছে। কিন্তু এই টেপটা বদলানোর কথা মনে থাকে না।

মতলব একটি মিথ্যে কথা বললো।

রেডিয়ো শোনো না কেন? মতলব মীরপুরের দিকে গাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে বললো।

না। না। রেডিয়ো না।

কি আশ্চর্য! রেডিয়োর ওপর এতো বিতৃষ্ণা কেন?

কি জানি ছাই। মনে হয় সুইচ অন করলেই পল্লী সঙ্গীত বাজবে।

মতলব হাসলো।

তারপর ট্রামপেটের শব্দটি বাড়িয়ে দিলো।

সত্যি করে বলো না তুমি কবে নতুন টেপ শোনাবে।

কালই শোনাবো।

সত্যি?

সত্যি।

না, বলো তিন সত্যি।

বললাম তিন সত্যি।

আসলে মতলব আবার মিথ্যে কথা বলতে বাধ্য হলো।

ওর টেপ একটাই।

যেমন ওর এক জোড়া জুতো।

এক জোড়া ট্রাউজার।

এবং একটি মাত্র সুট।

হাজী গফুর আলীর পুত্র ডক্টর মতলব আলী আমেরিকা হতে ফেরার সময় অতিরিক্ত যে পরিধেয় সঙ্গে এনেছিলো সেগুলো সে বিলি করতে বাধ্য হয়েছিলো।

আপাতত তার যেমন সামর্থ্য নেই নতুন পোশাক পাবার, তেমনি সামর্থ্য নেই নতুন টেপ কেনার।

সে এক কান্ড।

সুদীর্ঘকাল পরে মতলব যেদিন গ্রামে ফিরলো সেদিন।

আগে বাজিতপুরে যাবার সরাসরি কোনো পথ ছিলো না।

আজকাল বাঁধানো পথ আছে।

হাজী গফুর আলী এক সাইকেল রিকশায় তার কৃতী পুত্র মতলব আলীকে পাশে বসিয়ে সগৌরবে গ্রামে প্রবেশ করেছিলেন।

হজ হতে ফিরে সফিনা-এ-আরব হতে চট্টগ্রাম জেটিতে নামার সময়েও তিনি এতো গর্ব বোধ

করেননি।

ওদের সামনের দুটি রিকশায় ছিলো ভাড়া করা ব্যান্ড পার্টি। ‘শুনের শুনের জাঁহাপনা’র সুরে তাদের রিকশা এবং তাদের পেছনের রিকশা ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছিলো।

পেছনের রিকশায় ছিলো হাজী সাহেবের আত্মীয়স্বজন এবং শুভাকাজক্ষী। তারা মতলবকে দোয়া করতে এসেছিলেন।

আর ওদের রিকশার চারপাশে ছুটছিলো অর্ধ উলঙ্গ ছেলেমেয়ের দল।

সেদিন সে এক হৈ হৈ কাণ্ড। রৈ রৈ ব্যাপার।

নিজেকে এক জীবন্ত অবতার মনে হচ্ছিলো মতলবের।

অবশ্য সেই আনন্দানুভূতি খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। কেননা চাচা চাচী, ফুফু- ফুফা প্রভৃতিদের সালাম করার পর এবং বিভিন্ন সম্পর্কীয় ভাইবোনদের কুশল জিজ্ঞাসার পর মতলবকে খুলতে হয়েছিলো তার দুটি সুটকেস তার পিতার অনুরোধে।

বিলি করতে হয়েছিলো তাকে জুতো, মোজা, শার্ট, ট্রাউজার তার গুণমুখ আত্মীয়স্বজনকে। মতলব কোনো দিন ভাবেনি তার পোশাক পরিচ্ছদ এভাবে হরির লুটের মতো বিলিয়ে দিতে হবে।

হাজী গফুর আলী পুত্রের এই দানশীলতায় চোখ বন্ধ করে বাদামি দাড়ি নেড়েছিলেন। চোখ খোলা থাকলে তিনি নিশ্চয়ই দেখতেন মতলবের করুণ চাহনি।

শেষ পর্যন্ত টাইগুলো ছাড়া আর সবই চলে গিয়েছিলো। আল্লাহ মতলবের অশেষ মঙ্গল করবেন এই আশ্বাসবাণী দিয়ে বিদেশী মাল বগলদাবা করে আত্মীয় স্বজনরা সেদিন বিদায় নিয়েছিলেন।

সেদিন রাতে এশার নামাজ পড়তে হাজী সাহেবের দুচোখ বেয়ে পানি পড়েছিলো।

পুত্রভাগ্যে তিনি ঈশ্বরের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা বোধ করছিলেন। স্কুল থেকে ইউনিভার্সিটি, আর ইউনিভার্সিটি থেকে আমেরিকা পর্যন্ত মতলব যে একটানা বৃত্তিলাভ করেছে তার জন্যে তিনি মতলবের মেধা এবং এক নিষ্ঠাতাকে নয় - পরম করুণাময়ের করুণাকেই একমাত্র কারণ ভেবেছিলেন।

করুণার শেষ তো সেখানেই নয়।

মতলব কোনো মেম বউ সঙ্গে নিয়ে আসেনি।

ভালোয় ভালোয় দেশে ফিরে এসেছে। আর নিয়ে এসেছে আত্মীয় কুটুমের জন্যে এতো উপহার।

হাজী গফুর আলী নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছিলেন ঈশ্বরের কাছে।

খোদা। আমাকে অনেক দিয়েছে। এবার আমিও তুমি নাও। আমিন।

ড্রাইভিং মিররে মতলব নিজেকে একবার দেখে নিলো। বেলা পড়ে এসেছে তবু এতো গরম! সারা মুখটা তেল চিটচিটে হয়ে আছে। একটা বড়ো ব্রন উঠেছে গালের নিচে। বহুদিন কোনো যৌনকর্ম হয়নি সেজন্যেই বোধ হয়। একটি চিন্তা করলো মতলব। সেই কবে দেশে ফেরার আগে নিউইয়র্কে শেষ সুযোগ ঘটেছিলো। তারপর এতোদিন উপবাসী থাকতে হবে তা কি আর তখন জানতো?

কি ভাবছো?

না। কিছু না। রাজিয়ার প্রশ্নে মতলব বর্তমানে ফিরে এলো। একটি বাস ওভারটেক করলো। রাজিয়ার মুখের দিকে দু'চারবার তাকালো।
 কি দেখছো অমন করে? রাজিয়া হাসলো।
 দেখছি তোমার মুখে কোনো ব্রন আছে কিনা। মতলব গম্ভীরভাবে উত্তর দিলো।
 আবার কি অসভ্যতা?
 বাঃ অসভ্যতার কি হলো। তোমার বয়েস কতো?
 তারি বয়েই গেছে আমার বলতে।
 না বললেও আমি জানি। এম.এ. ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রীর বয়স কতো হওয়া উচিত তা সবাই জানে।

রাজিয়া কোনো উত্তর দিলো না।

বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকলো।

মতলব একটু হাসলো।

বয়স জিজ্ঞেস করলে মেয়েদের প্রতিক্রিয়া সর্বত্রই এক।

মতলব আর কিছু বললো না।

বিকেল তখন শেষ হয়ে আসছে।

সামনের পথ প্রায় ফাঁকা।

ওর লাল গাড়ি জোরে ছুটতে লাগলো।

ঠিক এমনি আরেক শেষ বিকেলে রাজিয়ার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিলো। মতলব তার ডিপার্টমেন্টাল হেডের ঘরে বসে ফোন করছিলো। তখন আর কেউ ছিলো না সেখানে। রাজিয়া পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করেছিলো, ভেতরে আসতে পারি?

মতলব ইঙ্গিতে ওকে প্রবেশ অনুমতি দিয়েছিলো। ফোনের কথা শেষ হবার পর জানতে চেয়েছিলো কিভাবে রাজিয়াকে সাহায্য করতে পারে। রাজিয়া বিকেলের টিউটোরিয়ালে আসতে পারেনি। কি টপিক আলোচিত এবং কি রেকর্ডেশন দেয়া হয়েছে রাজিয়া তাই জানতে এসেছিলো। মতলবের শিকারী বুদ্ধি মতলবকে বলেছিলো এ মেয়ে পটবেশে তাই ডক্টর মতলব আলী সেদিন প্রথমে শিক্ষামূলক পরে সমাজমূলক এবং সর্বশেষে ব্যক্তিগত সমস্যামূলক আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছিলো।

রাজিয়াকে ইতিপূর্বে সে দেখেছিলো ক্লাসে ক্লাসে মেয়েদের সঙ্গে। ওই পর্যন্তই।

অন্যান্যদের মতোই মনে হয়েছিলো রাজিয়াকে। ক্লাসের কোনো ছাত্রীর সঙ্গে ক্লাসের বাইরে আলাপ হবে এমন সম্ভাবনার কথা ভাবেনি সে। আর তাছাড়া সে নিজেও তেমন উৎসাহ বোধ করেনি। কারুর সঙ্গে আলাপের জন্যে। প্রাণবন্ত আমেরিকান মেয়েদের সঙ্গে অভিজ্ঞতার পর দেশী মেয়েদের দেখে মনে হয়েছিলো বাজারের টুকরিতে সাজানো একগাদা মরা ইলিশ মাছ। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে মতলব সর্বাধিক হতাশা বোধ করেছিলো ছাত্রীকুলের এই জীবনুত চেহারা দেখে।

যদিও উচ্চতা তার মাত্র পাঁচ ফিট পাঁচ ইঞ্চি এবং ওজন মাত্র একশো আট পাউন্ড তবুও আমেরিকায় মতলব চেষ্টা করছে অন্যতম ফাস্ট গাই হতে। হাজী গফুর আলীর পুত্র মতলব যার

ঢাকায় গাড়ি চড়ার অভিজ্ঞতা ইপি আরটিসির বাসের মধ্যেই সীমিত ছিলো, সে মার্কিন মুল্লুকে কয়েক মাসের মধ্যেই ড্রাইভিং শিখে নিয়েছিলো। এছাড়া কষ্ট করে হইকি বিয়ার খাওয়া আয়ত্ত্ব করেছিলো।

বান্ধবী কুলের অশেষ ধৈর্য এবং প্রচেষ্টায় মোটামুটি নাচ শিখেছিলো। পড়াশোনা এবং সে সম্পর্কিত আলোচনায় মতলবের সুনাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো।

সূত্রাং ক্ষুদ্রকায় মতলব আমেরিকার দীর্ঘাকার জীবনে অতি ভাড়াভাড়া মিশে গিয়েছিলো।

ফাস্ট লাইফ।

ফাস্ট গাই।

মতলব।

বাজিতপুরের হাজী গফুর আলীর পুত্র মতলব।

হাজী সাহেব অবশ্য কোনোদিনো জানবেন না যে করুণাময়ের করুণা নয়, মার্কিন সরকারের নির্দেশের ফলে মতলব দেশে ফিরতে বাধ্য হয়েছিলো। পিএইচডি শেষ করে সেখানে ইউনিভার্সিটিতেই চাকরি নিয়েছিলো। আরো কিছুদিন এবং সম্ভব হলে স্থায়ীভাবে থাকার চেষ্টা করেছিলো। প্রোফেসরের রেকমেন্ডেশন নিয়ে ইমিগ্রেশন অফিসে ছোট্ট ছুটি করেছিলো। কিন্তু কিছুতেই সেখানে থাকার অনুমতি পাওয়া গেলো না। ইঠাৎ একদিন তাকে ফিরে আসতে হলো। আসার সময় যা কিছু সঞ্চিত ডলার ছিলো তা দিয়ে এই জাপানি গাড়িটি কিনেছিলো।

আর এই গাড়ির জন্যেই দেশে ফিরে তাকে ধার করতে হয়েছে।

কাস্টমস ডিউটি ইত্যাদিতে হাজার চারেক টাকা গেছে। এখন মাইনে থেকে প্রতিমাসে সে টাকা শোধ দিতে হচ্ছে।

দিনে দু প্যাকেট প্রেয়ার্স নাঘার খি তার লাগে। থাকে এলিফ্যান্ট রোডে এক গাড়ির দোতলায় আরেক বন্ধুর সঙ্গে। শেয়ার করে যাবতীয় খরচ। এ সবেের ওপর আছে গাড়ির বার্নিং কষ্ট। মাঝে মাঝে তাই লাল গাড়িটাকে মতলবের মনে হয় শাদা হাতি।

সিনিয়র লেকচারারের মাইনে হাজার টাকার কম।

রীডার হয়ে যোগদানের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিলো।

বোর্চার মতলবের দূরবস্থার সীমা নেই।

গ্রামে সেই প্রথম দিনে কাপড় জামা বিলি হয়ে যাবার পর প্রায় এক বস্ত্রেই তাকে দিন কাটাতে হচ্ছে।

হাজী গফুর আলী আশা করেন তার কৃতী পুত্র তাকে মাসে মাসে কিছু অর্থ সাহায্য করবে। কিন্তু গাড়ির ধার শোধ কিংবা রীডার না হওয়া পর্যন্ত তা সম্ভবপর হবে না এ কথা মতলব ভালোভাবেই জানে।

মাঝে মাঝে সে তাই পার্সোনাল ইকনমির চেষ্টা করেছে।

সিগারেট খাওয়া ছেড়েছে। আবার ধরেছে। শস্তা ব্র্যান্ড চেষ্টা করেছে। আবার প্রেয়ার্স খিত্তে ফিরেছে।

পেট্রল হিসেব করে কিনেছে। কিন্তু বেহিসেবী গাড়ি চালিয়েছে। বিদেশে তার অভ্যাস ছিলো বই কেনার। আপাতত দেশে অভ্যাস করছে বই দেখার।

রাডি অফুল লাইফ। মতলব ক্ষেদোক্তি করেছে। এতো হিসেবের চিন্তা করলে অ্যাকাডেমিক চিন্তা করবে সে কখন?

ঢাকার এই সাত মাসের সমস্যা পরিপূর্ণ জীবনে মতলবের একমাত্র সান্ত্বনা রাজিয়ার সঙ্গে পরিচয়। অথচ কি আশ্চর্য!

রাজিয়া নিজে হতে এগিয়ে না এলে মতলব ধারণাই করতে পারতো না যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্ততঃ একটি প্রাণবন্ত মেয়ে আছে। অথচ মেয়েটি ঢাকারও বাইরে গিয়েছে কিনা সন্দেহ। এল এম এফ ডাক্তারের মেয়ে। গরীব বাবা বেশ কষ্ট করে ওকে পড়িয়েছেন।

থাকে ওন্ড টাউনে।

সাজে সাধারণ।

কি হলো তোমার হঠাৎ? স্পিড যে মিনিটে মিনিটে নেমে আসছে।

না কিছু না। চলো ফিরি এখন।

মতলব হেডলাইট জ্বালিয়ে দিলো। আকাশ হঠাৎ অন্ধকার হয়ে এসেছে। হয়তো ঝড় বৃষ্টি হবে। ওর গাড়ির উইন্ডস্ক্রিন ওয়াইপার দুটো চুরি হয়ে গিয়েছে। ঢাকার অভাবে নতুন ওয়াইপার আর কেনা হয়নি। এখন বৃষ্টি এলে অন্ধকারে গাড়ি চালানো অসম্ভব হবে।

মতলব মনে মনে হাসলো।

নতুন টেপ রাজিয়া শুনতে চায় কিন্তু সে তো জানে না এ মাসে তার অবস্থা কি।

আজ রাতে গাড়ির একটা টায়ার যদি কেউ খুলে নিয়ে যায় তাহলে সেই এক তারিখ পর্যন্ত এ গাড়ি অচল হয়ে থাকবে।

মতলব আচমকা ইউ টার্ন নিলো।

টেপ রেকর্ডারের সুইচটা অফ করে দিলো।

থাকুক না ওটা।

না। তার চেয়ে ফেরার পথে তুমি বরং একটা গান গাও। আমি গাড়ি চালাই।

তোমাদের কবরী রাজ্যাকের মতো?

কবরী রাজ্যাক যে এমনি করে তা কে বললো তোমাকে?

কে বলেছে সেটা অপ্রাসঙ্গিক। যা প্রাসঙ্গিক তা হচ্ছে সে আরো বলেছে রাজ্যাক গাড়িতে কবরীর হাত এইভাবে ধরে। বলতে বলতে মতলব রাজিয়ার নরম একটি হাত টেনে নিলো নিজের দিকে।

রাজিয়া কিছু বললো না।

কিছু বলবেও না যতোক্ষণ মতলব ওর হাতেই সীমাবদ্ধ থাকে।

মতলব এর আগে চার পাঁচদিন চেষ্টা করেছে হাতের বেশি অগ্রসর হতে। কিন্তু সফল হয়নি।

রাজিয়ার প্রতিরোধমূলক ক্ষমতা যথেষ্ট।

মতলবের অভিপ্রেতকে সে প্রতিবারই পরাজিত করেছে।

আর আশ্বাস দিয়েছে।

এখন না। পরে।

আর মতলব ভেবেছে ‘পরে’ শব্দটার প্রকৃত অর্থ কি?

কিসের পরে?

আরো কয়েকদিন চলার পরে?

আলোচনার পরে?

ঘনিষ্ঠতার পরে?

না। কোনো ঘটনার পরে?

মতলব তার প্রশ্নের উত্তর পায়নি। কিন্তু রাজিয়ার সংরক্ষণশীলতাকে সে ক্ষমা করে দিয়েছে। কেননা মেয়েটি আর সবদিকে এতো ফাস্ট। মতলব এর চাইতে বেশি এদেশে আশা করতে পারে না।

‘থ্যাক্স হেভেনস ফর সুইট রাজিয়া।’ মতলব বহবার বলেছে মনে মনে। আজো বললো একবার।

তারপর দ্রুতবেগে ফিরতে লাগলো ঢাকায়।

রাজিয়ার বাড়ি যে গলিতে সেটি খুবই সরু।

মতলব সাধারণত তাই গলির মুখে গাড়ি পার্ক করে ওকে পৌঁছে দিয়ে আসে। কাদা বাঁচিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রাজিয়া বলছিলো :

তুমি কিন্তু তোমার প্রতিজ্ঞা আজো রাখলে না।

কোনটা? আমি তো অনেক প্রতিজ্ঞাই করেছি তোমার কাছে।

তুমি বলেছিলে সাভার ছাড়িয়ে যাবে আর ড্রাইভ করবে আশি মাইল স্পিডে।

ও তাই বলো। বেশ আই প্রমিস। আগামী সপ্তাহে যাবো।

ঠিক তো?

ঠিক।

কিন্তু তার পরের কোনো সপ্তাহেই ওদের আর সাভার ছাড়িয়ে যায়নি। এবং মতলবের লাল গাড়িটিও আশি মাইল বেগে চলেনি।

সেদিন সন্ধ্যায় রাজিয়াকে পৌঁছে দিয়ে মতলব প্রথমতঃ শাড়িতে ফিরে এসে দেখলো ট্যাংক কতোখানি পেট্রল আছে। এ সপ্তাহটা ইকনমি করে চালান চলবে মনে হলো।

এতোক্ষণ রাজিয়ার সঙ্গে থেকে যে খুশিবোধটা হয়েছিলো পেট্রলের হিসেবে তা তিরোহিত হলো।

আগে ভেবেছিলো টিচার্স ক্লাবে দু মারবে।

কিন্তু না।

অফ মুডে কোথাও যেয়ে লাভ নেই।

মতলব বাড়ি ফেরাই সাব্যস্ত করলো।

ড্যাম ইট।

বাড়ি ফিরে সে আবাক হলো বাবাকে দেখে। সঙ্গে আরেক বয়স্ক ভদ্রলোক। তিনি দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় এবং ঢাকায় থাকেন বলে মতলব জানতো। কিন্তু বাবা এমন বিনা নোটিশে তো কখনো আসেন না। কোনো অসুখ বিসুখ হয়নি তো?

ব্লাডি হেল! মেডিকাল এক্সপেন্স যোগাড় করবে কোথেকে?

হাজী গফুর আলী অবিশ্যি শারীরিক এবং মানসিক উভয় দিকেই খুবই সুস্থ ছিলেন। ধীরে ধীরে তিনি আকস্মিক আগমনের কারণ ব্যক্ত করলেন। সঙ্গী ভদ্রলোকটির দিকে কৃতজ্ঞতার চোখে তাকিয়ে জানালেন যে তিনিই মতলবের জন্যে সুপাত্রীর স্বস্থান নিয়ে এসেছেন।

পাত্রীর বর্ণনা এবং পরিচয়ের পর মতলবের কোনো সন্দেহই থাকলো না যে পাত্রী সুপাত্রী। পাত্রীর বয়েস আঠারো। মতলবের বয়েস তিরিশ পেরিয়েছে কিন্তু সে বিশেষ নিচে মেয়ে চেয়েছে।

মতলবের রং কালো। পাত্রীর রং ফর্শা।

মতলবের চেহারা এখনো প্রামা ছাপ আছে। কিন্তু পাত্রী শহরেই মানুষ। শহরে চেহারা। পাত্রীর সবচেয়ে বড়ো গুণ?

পাত্রীর বাবা বিরাট বড়লোক। ঢাকার বেশ কয়েকটা পেট্রল পাম্পের মালিক এবং ফার্স্টক্লাস কন্সট্রাক্টর। সাতারের কাছেই দু'বিঘে জমি যে শুধু তিনি মেয়ের নামে লিখে দেবেন তা নয়। এছাড়াও নানাবিধ উপহার সামগ্রী দেবেন বলে তিনি জানিয়েছেন। আরো ইঙ্গিত দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরকারি যে কোনো স্থানেই তার অশেষ প্রভাব। মতলবের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্যে তিনি সে প্রভাব প্রয়োগ করতে কুণ্ঠিত হবেন না। প্রভাব বিহীন প্রতিভার স্থান আমাদের দেশে যে নেই সে কথা ঘটক আত্মীয়টি মতলবকে একবার মনে করিয়ে দিলেন। মতলব ঘাড় নেড়ে সায় দিলো।

ওরি মতো ডিগ্রীধারী আরেকজন এই সেদিন রীডার হয়ে যোগ দিয়েছে। কিন্তু মতলবকে রাজকন্যা এবং রাজত্বের অংশবিশেষ দেয়া হবে কেন?

উত্তর সহজ।

কন্সট্রাক্টর সাহেব নিজে বেশি পড়াশোনা করেননি। ছেলেমেয়েদেরও পড়াশোনা তথৈবচ। পাত্রীর ওটাই একমাত্র খুঁৎ। আই.এ ফেল করার পর আর পড়াশোনা করেনি। সুতরাং কন্সট্রাক্টর সাহেব তার পরিবারে এক বিদ্বান এবং জ্ঞানী ব্যক্তি আমদানি করতে চান। নামের আগে 'ডক্টর' শব্দটি জুলজ্যান্ত প্রমাণ মতলবের বিদ্যার। আর ওর জ্ঞানও যে যথেষ্ট তা সে প্রমাণ করলো প্রস্তাবিত বিয়েতে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে। আপনি যা ভালো মনে করেন আশ্বা। মতলব স্বপ্নে।

পিতার হাতে নিজেকে সে ছেড়ে দিয়েছিলো। হাজী গফুর আলী পুত্রের বিনয়, নম্রতা এবং বাধ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখে পরম মঙ্গলময়কে জানিয়ে ছিলেন তার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। কেবলমাত্র খোদাবিশ্বাসীরই এমন সুপুত্র হয়।

মতলব সে রাতে ঘটকের দেওয়া তার ভবিষ্যৎ স্ত্রী তাহমিনের এক সেট ছবি কয়েকবার নেড়েচেড়ে দেখলো।

তাহমিন।

সুন্দর নাম।

সুন্দর চেহারা।

প্রেয়ার নাসার খির ধোয়ার সঙ্গে রাজিয়ার সব স্ব্টি মতলব উড়িয়ে দিলো।

কিন্তু মতলব দুটি ভুল করছিলো।

বিয়ের দুদিন পর মতলব তার বৌ আর ছোটো শ্যালক মনুকে নিয়ে সাতারের দিকে চলেছিলো।

উদ্দেশ্য শ্বশুর মহাশয়ের বরাদ্দকৃত সাতারের জমি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা।

সেকেন্ড ক্যাপিটালের রাস্তায় এসে গাড়ির স্পিড পঞ্চাশে উঠতেই তাহমিন গাড়িতে বমি করে ফেললো। ফেটে যাওয়া দুধের মতো শাদা ছ্যাকরা ছ্যাকরা বমি।

মতলব তাড়াতাড়ি গাড়ি থামাতে বাধ্য হলো।

কি হয়েছে তোমার? শরীর খারাপ লাগছে না তো? সশব্দ আচরণ এবং চিন্তিত স্বর।

না এমনিই। লজ্জিত তাহমিন মুখ নিচু করে উত্তর দিলো।

মতলব পকেট হতে রুমাল বের করে বললো :

এই নাও। এটা দিয়ে মুছে ফেলো।

চলো বাড়ি যাই। তাহমিন খুব ধীর গলায় শাড়ি মুছতে মুছতে বললো।

বাঃ। এই কদিন তো ঘুরতেই পারলাম না। আজ ভেবেছিলাম তোমাকে নিয়ে একটা লম্বা রাইড দেবো। আর মনুকেও তাই বলেছিলাম।

কিন্তু মনুই উত্তর দিলো,

না দুলাভাই। বাড়ি চলেন। আপা একদম ট্রাভেল করতে পারে না। রেলো না, গাড়িতে না, প্লেনে না। উঠলেই গর বমি হয়। আমরা তাই সব সময় ওকে ফেলেই বেড়াতে যাই। ছোটোবেলা থেকেই আপাটা এরকম।

সেদিন ফেরার পথে বমির গন্ধে মতলবের সেই দুটি ভুল সংশোধন হয়েছিলো।

প্রথমত হবিতো প্রাণ দেখা যায় না।

দ্বিতীয়ত ধোঁয়া আর স্ব্টি এক নয়।

BanglaBook.org

খ্রীসের কোটিপতি শিল্প ও বাণিজ্যসম্রাট আরিস্টটল ওনাসিস বলে থাকেন তার বয়েস বাষট্টি। কিন্তু তার পাসপোর্টে যে জন্মতারিখ আছে সে অনুযায়ী বয়েস দাঁড়ায় তার ঊনসত্তর। এই তারতম্যের কারণ স্বরূপ ওনাসিস বলেন যে, ষোল বছর বয়সে তিনি যখন আর্জেন্টিনায় জীবিকা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন তখন তাকে বাধ্য হয়ে বয়েস বাড়িয়ে বলতে হয়।

মাত্র ষাট ডলার, যা প্রায় তিনশো টাকার মতো নিয়ে ওনাসিস সুদূর দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রা করেন। সেখানে তিনি প্রথমে টেলিফোন অপারেটরের কাজ নিলেন। পিতার তামাকের ব্যবসা ছিলো এবং ওনাসিস সে ব্যবসা কিছুটা জানতেন। সেই অভিজ্ঞতার জোরে কিছুদিন পরে তিনি শুরু করলেন তামাক ব্যবসায়ের দালালি। এর পরেই ইউরোপের বলকান তামাক আমদানি শুরু করলেন আর্জেন্টিনাতে। তার কিছুদিন পরে কিনলেন কতোগুলো মালবাহী জাহাজ। পঁচিশ বছর বয়স পূর্ণ হবার আগেই তিনি হলেন মিলিয়নেয়ার। এখন তিনি পৃথিবীর গুটিকয়েক ধনাঢ্য ব্যক্তির অন্যতম। প্রায় একশোটি সমুদ্রগামী জাহাজ, বহু বোয়িং প্লেন নিয়ে গঠিত অলিম্পিক এয়ারওয়েস, একটি দ্বীপ এবং নানাবিধ শিল্প ও বাণিজ্যের মালিক আজ আরিস্টটল ওনাসিস।

তিনি যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আততায়ীর গুলিতে নিহত প্রেসিডেন্ট কেনেডীর সুন্দরী পত্নী জ্যাকলিন কেনেডির সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন তখন বেশ জল্পনা-কল্পনা হলো। ওনাসিস এই বিয়ে কেন করলেন তার কারণ সম্পর্কে অনেক পণ্ডিত বললেন, ওনাসিসের বিচিত্র বাতিক হচ্ছে পৃথিবীর নামী ব্যক্তিদের সাহচর্যে থাকা এবং তাদের নিয়ে তাঁর বহুমূল্যবান প্রমোদতরী 'ক্রিস্টিনা' -তে পার্টি করা। উদাহরণস্বরূপ এই পণ্ডিতরা বললেন ওনাসিসের সুইমিংপুলে সন্ধ্যার কেটেছেন প্রখ্যাত চিত্রতরকার জুটি এলিজাবেথ টেলর ও তাঁর স্বামী রিচার্ড বার্টন। তার স্বাস্থ্যে নেচেছেন বিখ্যাত ব্যালে তারকা জুটি মার্গো ফনটেন ও রুডলফ নুরিয়েভ। এছাড়াও এসেছেন মোনাকোর রাজদম্পতি প্রিন্সেস গ্রেস ও প্রিন্স রেনিয়ার। হলিউডের ক্যারি গ্র্যান্ড স্টারের চার্লি এবং আরো অনেকে। ওনাসিস প্রেম করেছিলেন বিশ্বখ্যাত অপেরা গায়িকা স্যারিয়া কালাসকে। এখন বিয়ে করলেন মিসেস কেনেডিকে।

এই হলো এক অসাধারণ ব্যক্তির অসাধারণ বাতিকের দৃষ্টান্ত।

বৃটেনের রাণী এলিজাবেথেরও এক বাতিক আছে। সেটি হলো বিশ্বের যাবতীয় ডাকটিকিট সংগ্রহ করা।

এটি হলো এক সাধারণ ব্যক্তির সাধারণ বাতিকের দৃষ্টান্ত।

ঢাকার টিকাটুলির সরকারি কর্মচারি কেরামত হোসেন মন্ডলেও বাতিক আছে। তাঁর বাতিক হলো বাড়ি তৈরি করা।

এটি হলো এক সাধারণ ব্যক্তির সাধারণ বাতিকের দৃষ্টান্ত।

এই বাতিকাটি অনুন্নত এবং উন্নত এই দুই দশকে রাজধানী ঢাকার ক্রমোন্নতিশীল মধ্যবিত্ত বাঙালি মহলে প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বাঙালি মুসলমানদের ব্যবসায়িক বুদ্ধির বৈশিষ্ট্য এর অন্যতম কারণ। লক্ষণীয় যে খুব কম সংখ্যক অবাঙালি মুসলমান বাড়িতে টাকা নিয়োগ করেছেন। তাদের যা পুঁজি তা তারা সরাসরি ব্যবসাতেই খাটিয়েছেন।

সে যাই হোক, কেরামত হোসেন মন্ডল বাঙালি এবং বাঙালির গুণাবলীর তিনি ব্যতিক্রম নন। ব্যতিক্রম তিনি অন্যদিক থেকে হবার বাসনা পোষণ করেছেন। বাড়ির সংখ্যাধিক্যে পরিচিত বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় মহলের মধ্যে শীর্ষ স্থান লাভের আকাঙ্ক্ষা তার। আর্থশিকভাবে তিনি সফলও হয়েছেন। সেই সাফল্যের ইতিহাস এবং বর্তমান পরিস্থিতি সেদিন সকালে বারান্দায় বসে বসে ভাবছিলেন জনাব মণ্ডল।

আকাশটা সকাল থেকেই মেঘলা। বিকেলে বৃষ্টি পড়বে কিনা কে জানে। রেডিওর আবহাওয়া তত্ত্বে তিনি আস্থা রাখেন না। হঠাৎ তাঁর চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেলো স্ত্রী কুলুবেগমের তারস্বরে।

কবে থেকে তোমাকে বলছি এখানটা পাকা করে দিতে। একদিন পা পিছলে মরলে তোমার শিক্ষা হবে।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই তিনি রান্নাঘরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কেরামত হোসেন মন্ডলের মন অন্যদিকে ছোট্টা শুরু করলো।

ছাশিশ বছর আগে তিনি বিয়ে করেছিলেন কুলসুম বেগমকে। যুবক কেরামতের রোমান্টিক মন কুলসুমকে সর্গক্ষিপ্ত করেছিলো কুলু-তে। বয়স যখন বাড়লো, যখন অন্য সবার সামনে শুধু 'কুলু' বলে ডাকতে সঙ্কোচ হলো, তখন থেকে তিনি তাকে কুলু বেগম বলে ডাকা শুরু করলেন। সেই একই নামে তিনি তাকে আজো ডাকেন। কিন্তু কুলু কি সেই একই কুলু আছে? কেরামত মণ্ডলের মনে ঘোরতর সন্দেহ ডিগবাজি দিতে থাকে। সংসারের চাপে হতশ্রী হলেও এখনো কুলুবেগম কুশী হননি তা সত্যি। শরীরের গাঁথুনি হয়তো বা একটু দুর্বল হয়েছে। কিন্তু সেই প্রথম দিনের মতো এখনো তিনি চাবির ছড়া আঁচলে বাঁধেন। দিনে প্রায় দশ কাপ চা খানো খান। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে তার ব্যবহার কি আগের মতো আছে? প্রশ্নের উত্তর এক 'স্লিড' না মনে হলো কেরামতের। কই এখন কুলুবেগম আর তার স্বামীর সুবিধে-অসুবিধের কথা বুঝতে চান না। সেকালে তার সব চিন্তাতেই কুলুবেগম যে রকম অংশ নিতেন তা আর আজকাল নিতে চান না। কেরামত ভাবলেন, তার স্ত্রী বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছেন। অথচ তিনি স্বয়ং নিঃস্বার্থপরতার মাপকাঠিতে ওঠার চেষ্টা করছেন। স্ত্রীর এই আর্থিক অধঃপতনের শোচনীয়তার কথা ভেবে তিনি দুঃখ বোধ করছিলেন।

কুলুবেগম আবার রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তাঁর স্বামীকে ধিক্কার দিতে দিতে।

নিজের শখ মেটাতে মেটাতেই কবরে চলে যাবে। বৌয়ের সুবিধে-অসুবিধের কথা আর কখনো ভাবলে না। কপাল মন্দ। নইলে আত্মা এমন স্বার্থপরের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন কেন।

কেরামত কুলুবেগমের প্রতিটি অঙ্গ এবং মুখভঙ্গি লক্ষ্য করে গেলেন। স্ত্রীর স্ফীতকায় মেদবহুল কোমর এবং নিতম্বের ভাঁজে শাড়ি-এ সবি বহু পরিচিত। এ সবি তার ভালো লাগে। অবশ্য বয়েস

নিজেরও পঞ্চাশোত্তীর্ণ। তাই কবারে যাবার কথা উল্লেখ করায় তিনি স্ত্রীর প্রতি ক্ষুব্ধ হন। এখনো তিনি পুরোদমে কাজ করে চলেছেন অফিসে এবং এখনো বাড়ি বানিয়ে চলেছেন। দুঃখ হয়, তার স্ত্রী কোনোদিনো তাঁর কর্মরত চেহারা দেখেননি বলে। নইলে স্ত্রী তাকে অচিরেই বৃদ্ধ ভাবতেন না। কুলসুম যদি তাকে দেখতেন কোনো বাড়ির দেয়াল তোলার বা ছাদ ঢালাইয়ের সময়। কি রকম তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে এতোগুলো মিস্ত্রিকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হয় সুচারুভাবে।

কিন্তু কুলসুমকে বহু অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি কোনো বাড়ি নির্মায়মান অবস্থায় দেখেননি। কেরামতের বাড়িগুলোর ওপর তার তীব্র অভিমান। কেরামত অবিশ্যি খুবই আশা করেছিলেন যে এই মুহূর্তে যে বাড়িটি তৈরি শেষ হচ্ছে অন্তত সেই বাড়িটির নির্মাণ স্ত্রী দেখবেন। কারণ তিনি তাকে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বাড়িটি তৈরি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই টিকাটুলির এই বাড়ি ছেড়ে নতুন বাড়িতে উঠবেন।

কিন্তু কুলসুম তার প্রতিজ্ঞা বিশ্বাস করেননি। কারণ সহজ। কেরামত তার ইতিপূর্বের নির্মায়মান বাড়িগুলোর সময়ে এই একই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অথচ শেষ পর্যন্ত তার চারটি বাড়িই ভাড়া দিয়েছেন কেরামত হোসেন মন্ডল। সুতরাং কুলু বেগমের বাড়ি পর্যবেক্ষণে এতো অনীহা। সুতরাং তিনি তাঁর স্বামীকে আজকাল এক অর্থলোভী ভণ্ড ভাবতে শুরু করেছেন।

অথচ কেরামত হালপ করে বলতে পারেন যে, তার অর্থলোভ নেই এবং তিনি ভণ্ড নন। ঋণের পাকচক্রে বাড়িগুলো ভাড়া হয়ে গিয়েছে সত্যি কিন্তু তৈরি করবার সময় তার ইচ্ছে ছিলো টিকাটুলির এই বাড়ি থেকে সরবেন।

এতোগুলো বাড়ির মালিক হয়েছেন তবু নিজে থাকেন এক ভাড়া বাড়িতে এ কথা ভেবে তিনি মাঝে মাঝে অস্বস্তি বোধ করতেন। অবিশ্যি তিনি নিজেকে সান্তনা দিতেন এই ভেবে তাঁর জানাশোনা অনেকেই একই ফর্মুলায় বাড়ি বানিয়ে নিজেরাই থাকছেন ভাড়া বাড়িতে।

টিকাটুলির এই বাড়িটি অতীতে কোনো হিন্দু ভদ্রলোকের ছিলো। নাম 'চন্দ্রানন্দ'। ভদ্রলোকের মেয়ের নাম নাকি ছিলো চন্দ্রা। কেরামত মণ্ডলের ভারি ভালো লেগেছিলো এই বাড়িটি। বাড়ির নাম মেয়েদের নামে রাখা। তাঁর চার কন্যা - আনোয়ারা, মনোয়ারা, জাহানারা ও রোশনারা। তাদের নামেই তার বাড়িগুলো। ইশকটনে আনোয়ারা মঞ্জিল। ধানমন্ডিতে মনোয়ারা মঞ্জিল এবং জাহানারা মঞ্জিল ও গুলশানে রোশনারা মঞ্জিল। এই চার মঞ্জিলের নামে তিনি সর্বশরীরে পুলক অনুভব করেন। তার কর্মক্ষমতার চূড়ান্ত প্রমাণ এই চারটি বাড়ি। চারটি বাড়ির প্রতিটি ইট, কাঠ ও লোহা কেরামত হোসেন মন্ডলের সাফল্য ঘোষণা করেই আজকের বর্ধিষ্ণু সমাজে। তাই কেরামতের এতো আত্মপ্রত্যয়। তাই তিনি জেডিস্ট ক্লাবের বিয়ের প্যাণ্ডেলে অথবা শাহবাগ হোটেলের হলে আর পাঁচজন্যের সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হয় তখন সগর্বে বাড়ির ইতিহাস আলোচনা করতে পারেন।

সত্যিই কেরামতের এই সাফল্য অনেকেরই ঈর্ষার বিষয়। কেউবা হয়তো একটি, কেউবা দুটি, কেউবা তিনটি বাড়ি করেছেন। কিন্তু চারটি বাড়ি এখনো অনেকেই করে উঠতে পারেননি। আর বাড়ি বানানোর ফর্মুলা এমন অদ্ভুত যে একবার যে লিড নিয়েছেন তাকে সংখ্যায পেছনে ফেলা প্রায় দুঃসাধ্য। অনেকটা বয়সের মতো। একবার যিনি বয়সে বড়ো তিনি সব সময়ই বয়সে বড়ো থেকে যান।

কেরামতের ভাগ্য ভালো ছিলো। পার্টিশনের পর পরই শ্বশুর হঠাৎ পটল তুলেছিলেন। কুলসুম

উত্তরাধিকারসূত্রে এক থোকা টাকা পেয়েছিলেন। কেরামত ব্যাঙ্কে টাকা না রেখে রিয়াল প্রপার্টিতে ইনভেস্ট করেছিলেন - জমি কিনেছিলেন অপেক্ষাকৃত কম দামে। সরকারি কর্মচারি হিসেবে এ্যালটমেন্টের সময়ের ফন্ডিফিকরণগুলো সাধারণের চাইতে তার ভালো জানা ছিলো। তাই নতুন টাউন প্রানিংয়ের সময়ও স্বনামে বেনামে কিছু জমি কিনেছিলেন। ঘুষের তিনি পক্ষপাতী অবিশ্যি ছিলেন না। কিন্তু তার প্রতিপত্তির সুযোগ নেবার বিপক্ষেও ছিলেন না। বলতেন, সরকারি অফিসে কাজ করি বলে যদি আমাকে সাপ্লার্সারি ক্রেডিটে চুন-সুরকি, ইট দেয় তাহলে দোষ কোথায় আমি দেখি না।

বলা বাহুল্য যে ধারে তিনি বাড়িগুলো করেছিলেন সে ধার আর কোনো কালেই শোধ করা হয়নি। তার কারণ কেরামতের টাকার অভাব কোনো দিনও আর মেটেনি। আনোয়ারা মঞ্জিল যখন প্রায় শেষের দিকে তখন তিনি এক এমবাসি থেকে ভাড়া অফার পেয়ে গেলেন। দু'বছরের ভাড়া অ্যাডভান্স দিয়ে দিলো। কেরামত সহজ যুক্তিতে দেখলেন ওই টাকায় চটপট আনোয়ারা মঞ্জিল তৈরি শেষ হয়ে যায় এবং আরেকটা বাড়ির কাজও বেশ কিছুদূর এগিয়ে যায়। এই ভাবে প্রথম বাড়িতে আর তার যাওয়া হলো না। যদিও তিনি স্ত্রীকে বলেছিলেন :

তোমার অম্বার টাকায় তোমাকেই বাড়ি তৈরি করে দিচ্ছি। টিকাটুলিতে আর থাকতে হবে না। নিউ টাউনে থাকবে। শহরের মাস্টার প্র্যানে ইশকাটনের মতো জুড়ি জায়গা আর নেই।

সুতরাং যেদিন থেকে আনোয়ারা মঞ্জিল ভাড়া হয়ে গেলো, সেদিন থেকেই কুলসুম তার স্বামীর প্রতিশ্রুতির ওপর আস্থা হারিয়েছিলেন। তাই তিনি আর কোনো বাড়ি তৈরির সংবাদে উৎসাহিত হননি। শুধু বছরের পর বছর স্বামীকে গঞ্জনা দিয়ে গেছেন।

চন্দ্রালয় পুরানো প্যাটানের বাড়ি। সামনে জায়গা কম। পেছনে বেশি। একতলা। দেয়ালের চুন-সুরকি কোথাও কোথাও খসে এসেছে। জানালা দরজায় বহুকাল রং পড়েনি। দুপাল্লার দরজা। ছোট জানালা। উল্লেখযোগ্য ঘর মাত্র তিনটি। একটি স্বামী-স্ত্রীর শোবার। একটি বসার এবং তৃতীয়টি তাদের অবিবাহিত দুই কন্যা জাহানারা ও রোশনারার দখলে। প্রতিটি ঘর আসবাবপত্র ও জিনিসপত্রে ঠাসাঠাসি। বিবাহিত দুই কন্যার কেউ যদি এসে পড়ে তাহলে তার অসুবিধে হয় জাহানারা ও রোশনারার। নিজেদের ঘর ছেড়ে দিতে হয় বাধ্য হয় এবং স্বামী-কলেজের পড়াশোনা তখন শিকেয় ওঠে। আর যদি জামাইরা এসেই যায় তখন এক কলেজের কাণ্ড। গেট-এ ওয়ার্ডের মতো পারমুটেশন করে গেট এ প্রেস টু ব্লিপ বের করতে হয়। বসার ঘরে ঢালাও বিছানাতেও সমস্যার সমাধান হতে চায় না।

ভয়েতে কুলবেগম ওদের কখনো সেধে আসতে বলেনি। শুধু অবাধ হয়ে ভেবেছেন তার স্বামী মন্ডলের চার-চারটি বাড়ি আছে এবং তাতে না জানি কতো ঘর আছে। সুতরাং স্বামীকে তিনি অভিশাপ দিয়েছেন।

এই বয়সে যদি জামাই আদর না করতে পারি তবে আর করবো কবে? মেয়েদের বিয়ে দিয়ে যে একেবারে পর করে দিলাম। বলি তোমার কি ওদের দিকে একটু খেয়ালও নেই?

মেয়েদের দিকে কেন, সম্প্রতি স্ত্রীর দিকেই মন্ডল আর খেয়াল দিতে পারছিলেন না। কুলবেগমের সবচেয়ে দুঃখ ছিলো চন্দ্রালয়ের আরেকটি অসুবিধের জন্যে। রান্না ও ভাড়ারগুলো যেন বিন্ডিং থেকে একটু দূরে ছিলো। মাঝখানে একটা উঠান এবং টিউবওয়েল। টিউবওয়েল থেকে ভালোই হয়েছিলো। ঢাকার পানি সরবরাহের ওপর সব সময় নির্ভর করতে হতো না। কিন্তু উঠান হতে রান্নাঘরে যাবার পথটা পাকা না হওয়ায় ভারি অসুবিধে হতো। বৃষ্টির দিনে চলাফেরায় উঠান

কাদাময় এবং পিছলা হয়ে যেতো। বহুদিন তিনি স্বামীকে উঠানের এই পথটি পাকা করে দিতে বলেছেন। কিন্তু কেরামত এই সামান্য কাজটি করে উঠতে পারেননি। কুলু বেগম চিৎকার করতেন।

ভাড়ার বাড়ি কি একটা পয়সাও খরচ করতে পারো না? আর ওদিকে তোমার ভাড়াটেরা যে এতো খরচ করে তোমার বাড়ির ওপর? একটুও শিক্ষা হয় না দেখে?

কেরামত সবই মুখ বুজে সহ্য করছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো একদিন কুলু বেগম তাঁর এই কার্পণ্যের প্রকৃত মর্ম বুঝবেন। তিনি কি কোনো কাল কৃপণ ছিলেন? কোনোদিনই না। গত কয়েক বছর যে একটু হিসেব করে চলতে হয়েছে এতো নিভাস্তই সাময়িক। দুদুটো মেয়ের বিয়ে দিয়ে বাড়ি করতে গেলে একটুতো হিসেব করেই চলতে হবে। এই সহজ অঙ্কটা কেন যে কুলু বেগম বুঝতে পারেন না। আর তাছাড়া এবার নিজের বাড়িতে উঠে গেলে এ প্রশ্নই আর থাকবে না। কেরামত নিজেকে প্রবোধ দিয়েছেন। স্ত্রী-জাতির আর্থিক বুদ্ধির নিম্নমানে করুণা অনুভব করছেন। ইতিমধ্যে তার একটি বাড়ি থেকে চারটি বাড়ি হয়েছে। সেই একই ফর্মুলায়। ব্যাংকের ধার, ইনশিওরেন্সের ধার, হাউস বন্ডিং ফাইন্যান্সের ধার, সাপ্লায়ারের ক্রেডিট এবং নতুন ভাড়াটের মোটা আয়ডাঙ্গ। বাড়িগুলো ভাড়াও দিয়েছেন। বিদেশীদের কাছে। বাড়ির ভাড়াটে বাছাই করার সময় ঢাকার ল্যান্ডলর্ডরা বিলেতের ল্যান্ডলেডিদের চাইতেও বেশি প্রেজুডিসড বা বর্ণের তারতাম্য করে থাকেন। শুধু তফাৎ এই যে, বিলেতে ল্যান্ডলেডির বর্ণবিদ্বেষ যে আছে একথা সহজে স্বীকার করবেন না। আর ঢাকার ল্যান্ডলর্ডরা ঢাক পিটিয়ে বলেন যে, তারা সাহেব ভাড়াটে চান। কেরামত মন্ডল অবিশ্যি একবার একটি বাড়ি এক বাঙালি পরিবারকে দিয়েছিলেন। দিয়ে প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। জানালার কাচ ভাঙা থেকে শুরু করে দেয়ালের গায়ে পানের পিক পর্যন্ত কিছুই বাদ যায়নি। এ ছাড়া কয়েকটি ছিটকিনি, ল্যাম্প হোল্ডার ইত্যাদি অদৃশ্য হয়েছিলো। তারপর কেরামত 'হোয়াইটস ওনলি' বিজনেস পলিসি নিয়েছেন। এখন তিনি নিশ্চিত। তার চার বাড়িই বিদেশীদের হাতে। 'নো কালার্ডস'!

তিনি আজ সকালে বারান্দায় বসে মেঘ দেখছিলেন আর ভাবছিলেন বৃষ্টির আগেই যাবেন কিনা গুলশানে। সেখানের একটি ভালো প্লটে তার পঞ্চম বাড়িটির কাজ আজ শেষ হবে দুপুর নাগাদ। দু'একটা ইলেকট্রিক ওয়ারিং এবং স্যানিটারি ফিটিংয়ের কাজ থাকি আছে। মিস্ত্রিদের পয়সা কড়ি দিয়ে বিদায় করতে হবে। তারপর ফিরে এসে বিকেলে নিজে যাবেন আশা করছেন কুলু বেগমকে। এই তার স্বপ্নের বাড়ি যা তিনি স্ত্রীকে দিতে চেয়েছিলেন বহু বছর আগে। দেরি হয়ে গেলো বটে কিন্তু তবুতো হলো। 'বেটার লেট দ্যান নেভার' ইংরেজি প্রবাদ বাক্যটি মনে মনে একবার ঝালিয়ে নিলেন। কুলু বেগমকে তিনি একটা বিরাট সারপ্রাইজ দেবেন। কুলু বেগম জানেনও না এই বাড়ির নাম কি। মেয়েদের ধারণা, অন্য বাড়ির ধাঁচেই এ বাড়ির নাম হয়তো হবে কুলসুম মঞ্জিল। কেরামত তাদের বলেছেন :

না, তোরা কিছুতেই বলতে পারবি না। যে পারবে তাকে আমি গ্যারাজের ওপর ঘরটায় থাকতে দেবো।

ছোট মেয়ে রোশনারা জিজ্ঞাসা করেছে :

আচ্ছা, নামটা তো আমাকে নিয়ে

অনেকটা তাই।

কুলসুম মঞ্জিল না তুমি তো বলেছো।

হ্যাঁ।

তাহলে নিশ্চয়ই বায়তুল কুলসুম।

সোৎসুক রোশনারা প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রশ্ন করে। কেরামত আর অখসর হন না। বলেন :
যেদিন ও বাড়িতে উঠবো সেদিন তোরা শুনবি।

দূর থেকে বাপ-মেয়ের কথাপোকথনে ক্রুদ্ধ হয়েছেন স্ত্রী।

ঢং শুনে আর বাঁচি না। ও বাড়ি যেদিন শেষ হবে সেদিনই আরেক ভাড়াটে আসবে।
মেমসাহেবের নোট তোর বাপ কোনোদিনও ফেলবেনা। পাষণ্ড কোথাকার।

কেরামত কোনো উত্তর দেননি। অপেক্ষা করেছেন আজকের দিনটির জন্যে। আজ বিকেলে
সব অভিযোগ ও সমালোচনার উত্তর একসঙ্গে দেয়া হয়ে যাবে যখন তারা সবাই নতুন বাড়িতে
উঠবেন। ইসলামপুর পাথরের ফলকে যেখানে নাম লেখানো হয় সেখানে তিনি নিজে গিয়ে অক্ষরের
ডিজাইন পছন্দ করে বাড়ির নেমপ্লেট অর্ডার দিয়ে এসেছেন। তাঁর অনেকদিনের ইচ্ছে বড় শাদা
পাথরের বাংলা সুন্দর অক্ষরে বাড়ির নাম লেখা থাকবে গেটে।

গতরাতের কথা ভাবছিলেন কেরামত। গুলশানে তদারকি করে ফিরে এসেছিলেন বেশ
দেরিতে। বিছানায় অর্ধঘুমন্ত অবস্থায় পাশ ফিরে শায়িতা ছিলেন কুলসুম। জানালা দিয়ে যেটুকু
চাঁদের ফ্যাকাশে আলো আসছিলো সেটুকু এসে পড়ছিলো কুলসুমের দেহের ওপরে। অনেকদিন
পর কেরামত কুলসুমের যে অর্ধেক বালিশ শূন্য ছিলো সেখানে মাথা রাখলেন। এবং ধীরে তার
সর্বশরীর স্থাপন করলেন স্ত্রীর পাশে। কুলসুম একটু অসুস্থ আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে
কেরামত বিচলতি হননি। হঠাৎ তার ফিরে এসেছিলো শিল্পীর দক্ষতা। রতিবিম্বটুকু সে রাতে
তিনি পরিবর্তিত করেছিলেন উনুখ, উত্তেজিত এবং অশান্ত এক রমণীতে। যতদিন পরে সর্ব মন
দিয়ে তিনি তাঁর সাহচর্য ভোগ করলেন। দীর্ঘদিনের ভার যেন সে রাতে মুক্ত হয়েছিলেন কেরামত
মন্ডল। তার মনের কোণায় কাজ করেছিলো জীবনে জয়ী হওয়ার অনুভূতি - তিনি জানতেন
পরদিনই নতুন গৃহে প্রবেশ করবেন কুলসুম নিয়ে।

ঠিক বৃষ্টির আগেই কেরামত উপস্থিত হলেন নতুন বাড়িতে। বাড়িতে ঢোকায় সঙ্গে সঙ্গেই
বৃষ্টি শুরু হলো।

দেখতে সুন্দর হয়েছে এই দোতলা বাড়িটি। সামনে বড়ো লন। ফুলের গাছ লাগানো হবে
পরে। গাড়ি-বারান্দার পরেই গারাজ। গারাজের ওপরের ঘরটি রোশনারাকে দেবেন। আজকাল
কেন যে ছেলেমেয়েরা চিলেকোঠায় থাকতে চায় না বুঝে ওঠেন না তিনি। দুদুটো পেষ্ট রুম।
কুলসুম ভবিষ্যতে জামাই কেন, নাতি-নাতনীদেবের নিয়েও থাকতে পারেন। রান্নাঘর বিরাট।
ভাঁড়ার ঘর বিরাটতর। কুলসুম নিশ্চয়ই খুশি হবেন ভাঁড়ার ঘরে এত শেলফ দেখে। নিজেদের
শোবার ঘর দক্ষিণমুখী। ঘরে চুনকামের গন্ধ এখনো রয়েছে। একটা ডাবল বেড গতকালই
ডেলিভারি দিয়ে গেছে। চন্দ্রালয়ের কিছু কিছু জিনিস তিনি বিক্রি করে দিয়ে আসবেন। তার মধ্যে

ওদের বহু বছরের পুরনো খাটটি অন্যতম। এই নতুন ডাবল বেডটি স্থিতির ম্যাট্রেস শুদ্ধ। আরো কয়েকটি জিনিসপত্র এসে গিয়েছে চন্দ্রালয় হতে। বাকি জিনিসপত্র আসতে হয়তো আর দিন দুয়েক লাগবে।

শোবার ঘরের সঙ্গেই বাথরুম। বহুদিন রাত কুলসুম আটাচড বাথরুমের অভাবের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। বাথরুমের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন তিনি। ফ্লাশ টেনে দেখলেন ঠিক আছে। শাওয়ারের পানি ঠিক আসছে। শীত আসার আগে একটা হীটার লাগিয়ে দেবেন তিনি। এবার একটু পয়সা খরচ করে দেখাতে হবে কুলসুমকে। বেসিনের পানির ট্যাপটা খুলে দিলেন কেলামত। হ্যা পানি ঠিক আসছে।

এক দৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তিনি সেদিকে। ঝরঝরিয়ে পানি বেরিয়ে আসছে। অবিরাম এবং অশেষ পানি। গতরাতের কথা তার মনে পড়লো। এমনি অবিরামভাবে অবাধ ব্যবহার তিনি করেছিলেন স্ত্রীর সঙ্গে। আজ রাতেও কি তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে? আজো কি তিনি ফিরে পাবেন তাঁর হারানো দক্ষতা? রোমাঞ্চ বোধ করেন সব কিছু ভেবে। ধীরে পানির ট্যাপটা বন্ধ করে দিলেন তিনি।

ফিরে এলেন নিচে লাউঞ্জ-কাম-ডাইনিং রুমে। ভবিষ্যতে নাতি-নাতনীদেব বড়ো জন্মদিন পার্টি করা যাবে এমনি এক বিরাট ঘর। মেঝেটা অপরিষ্কার রয়ে গেছে। মিস্ত্রীদের ডাক দিলেন তিনি।

হিসেব মিটিয়ে ফিরে যাবেন তিনি ঠিক এমনি সময় একটা বিরাট গাড়ি এসে থামলো বাড়ির সামনে। শোফার চালিত শেডলে থেকে নেমে এলেন দুজন বিদেশী ভদ্রলোক।

মে উই সি দি ল্যান্ডলর্ড প্রিন্স?

আমিই ল্যান্ডলর্ড।

ভেরি প্রিন্স টু মিট ইউ।

বলতে বলতে একটি সাহেব ওয়ালেট থেকে তার কার্ড দিলেন কেলামতকে। ভদ্রলোকের নাম এফ. এস. কার্কপ্যাট্রিক। একটি বিদেশী কূটনৈতিক প্রতিনিধি।

কেলামতকে তারা জানালেন যে ঢাকায় তাদের মিশনের কর্মচারীদের জন্যে ভালো বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছেন তারা। এই বাড়িটির খোঁজ পেয়েছেন কেলামতের অন্য ভাড়াটে হতে। এবং আপাতদৃষ্টিতে বাড়িটি তাঁদের পছন্দ। মিঃ কার্কপ্যাট্রিক বাড়িটি ঘুরে দেখতে চাইলেন। কেলামত মন্ডল একটু চুপ করে থেকে জানালেন যে বাড়িটি ভাড়ার জন্যে নয়। তার বসবাসের জন্যে।

হাউ এক্সট্রাঅর্ডিনারি! হাওয়েভার, বাড়িটি দেখতে সত্যিই সুন্দর। ভেতরটা তাই দেখবার জন্যে কৌতূহল বোধ করছি।

কার্কপ্যাট্রিক বললেন। কিন্তু তার প্রথম উক্তিতে শ্রেয় নিহিত থাকায় কেলামত খুব খুশি হতে পারলেন না। ভাবলেশহীনভাবে তিনি উত্তর দিলেন :

বেশ তো। আপনারা ঘুরে আসুন।

কেলামত বসেই রইলেন। সাহেব দুজন ভেতরে চলে গেলেন। অন্যান্য বাড়ির সময় তিনি নিজের সঙ্গে থেকে প্রতিটি পাওয়ার পয়েন্ট পর্যন্ত তিনি ভবিষ্যৎ ভাড়াটেকদের দেখিয়েছেন। কিছুক্ষণ

পরেই সাহেবদের উদয় হলো।

ওয়েল মিঃ মন্ডল। আপনার বাড়ি আমাদের খুবই পছন্দ হচ্ছে। যদি ভাড়া দেন তাহলে আমাদের দিলে খুবই খুশি হবো। আপনি কি আরেকবার বিবেচনা করে দেখবেন? আমরা তিন বছরের ভাড়া পর্যন্ত অ্যাডভান্স দিতে রাজি আছি।

কেরামত মনে মনে হাসতে বাধ্য হলেন। এই অ্যাডভান্স আদায় করতে তাকে আগে কতো কথা খরচ করতে হতো। আর আজ না চাইতেই পাচ্ছেন।

না মিঃ কার্কপ্যাট্রিক। এ বাড়ি ভাড়ার জন্যে নয় – এ বাড়ি আমার ওয়াইফের জন্যে।

খুবই দুঃখের কথা। তবু আমাদের কার্ড রইলো। ওখানে ফোন নাম্বারও আছে। যদি বিকেল ছটার মধ্যে আপনি মত পরিবর্তন করেন তাহলে ওই নম্বরে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলে খুশি হবো। ছটার পরে আমাদের অন্য আরেক ল্যান্ডলর্ডকে পাকা কথা দিতে হবে। গুডবাই।

সশব্দে সাহেব দুজন চলে গেলেন। বৃষ্টি কখন যেন শেষ হয়ে গিয়েছে। কেরামতও বাড়িমুখো হলেন।

কিন্তু চন্দ্রাণ্ণয়ের সামনে আসতেই কেরামত অবাক হয়ে গেলেন। অ্যাথুলেঙ্গ কেন বাড়ির সামনে? চেনা-অচেনা লোকের এতো ভীড় কেন বাড়িতে? এতো থমথমে কেন সব? অজানিত এক শঙ্কায় কেরামত ভীত হয়ে পড়েন। তাকে আসতে দেখে ডাক্তার ছুটে এলেন। দু'বাড়ি পরেই উনি থাকেন। ডাক্তার কেরামতকে দ্রুত গলায় বললেন :

আসুন তাড়াতাড়ি আমার গাড়িতে। অ্যাথুলেঙ্গ এখনি ছাড়ছে।

গাড়িতে পেশাদারি শান্ত গলায় ডাক্তার জানানেন মিসেস মন্ডলের মৃত্যুর কথা। বৃষ্টির সময় রান্নাঘরে ছুটে যাবার সময়ে কাদায় পা পিছলে পড়ে যান তিনি। টিউবওয়েলের সঙ্গে মিসেস মন্ডলের মাথা বাড়ি খায় এবং অত্যধিক রক্তক্ষরণের ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে। চিকিৎসা করার সময় ছিলো না। সবটাই এক আকস্মিক শোচনীয় দুর্ঘটনা।

সেদিন বিকেল ছ'টার মধ্যে দুটি কাজ করেছিলেন মিঃ মন্ডল। প্রথমত মিঃ কার্কপ্যাট্রিককে ফোন করে বাড়িটি ভাড়া দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত বাড়ির নামের পাথরের ফলকটির অর্ডার কামিশ্প করছিলেন।

‘তাজমহল’ কুলসুম দেখে গেলেন না। কিন্তু কেরামতের ক্ষেদ আরো বড়ো। সম্রাট শাহজাহানের তাজমহলে মোমতাজের দেহরক্ষা হয়েছিলো। শাহজাহান তাঁর মৃত্যুর পরে অশরীরি স্ত্রীর পাশে শয্যালাভ করেছিলেন। কিন্তু জনাব মন্ডলের তাজমহলে মিলন কোনোদিনই সম্ভবপর হবে না।

সুইজারল্যান্ডে জারমাট, লুসার্ন হচ্ছে টুরিস্টদের শহর।

বার্ন রাজধানী।

আর জুরিখ সব ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র।

সেন্ট্রাল ইওরোপে জুরিখই বোধ হয় সর্বাধিক ব্যস্ত এয়ারপোর্ট। চারদিকে আল্পস পর্বতমালার চূড়া। আর তার মাঝখানে কিছুটা সমতল ভূমির ওপরে এই এয়ারপোর্টটিতে প্লেনগুলো যখন নেমে আসে তখন মনে হয় যেন পাহাড়ের চূড়াতেই ওরা ক্র্যাশল্যান্ড করবে।

এয়ারপোর্টের এক কোণায় সুইসএয়ারের রেডক্রস মার্কা কতোগুলো ক্যারিভেল আর বোয়িং স্ট্যাক করা।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।

বাতাসে হিমশীতল পানির হাঁট।

হলদে রংয়ের ওয়াটার ট্রাফিক জ্যাকেট এবং ট্রাউজার পরিহিত কয়েকজন এন্ড্রু মেকানিক কাজ করে চলেছে একটি বোয়িংয়ের চারপাশে।

অন্য একটি লোক একাই একটি সুরু, লম্বা ইলেকট্রিক পিক আপ চালিয়ে আসছে। পিক আপের ওপর সদ্য অর্গাত একটি প্লেন হতে নামানো নানা রংয়ের ও নানা লেবেলের লাগেজ। ওগুলো আসছে এই প্যাসেঞ্জার লাউঞ্জে।

লাউঞ্জের এই সুবিরাট কাচের দেয়ালের ওপরে বিমানবন্দরের কাজকর্ম আর প্লেনের আনাগোনা লক্ষ্য করে কেটে যায় অপেক্ষামান যাত্রীদের সময়। তারপর এক সময়ে দেয়ালের গায়ে লাগানো অ্যাম্পলিফায়ার হতে ডাক আসে প্লেন অভিযুক্ত অগ্রসর হবার জন্যে। মিষ্টি নারী কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হতে থাকে প্লেনের ফ্লাইট নাম্বার এবং ডেস্টিনেশনগুলো— ইংরেজি, ফরাসি, ইটালিয়ান ও জার্মান ভাষায় এক কাচের দেয়াল হতে আরেক কাচের দেয়ালে। বিভিন্ন দেশের যাত্রীরা ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছেন অথবা বসে বসে প্যারিস ম্যাচ, অটোকার প্রভৃতি সাময়িকী কিনে কোনো পকেট বইয়ের পাতা উল্টে চলেছেন। নয়তো বা পড়ে চলেছেন নিবিষ্ট চিওঁ দৈনিক কাগজগুলোতে শেয়ারের দাম ওঠানামার খবর। মাঝে মাঝে সুইস এয়ারের সুগঠিত এয়ার সিস্টেমের ছোট্ট ছোট্ট।

স্যারা লাউঞ্জ ভর্তি মেলা রকমের ছোটো ছোটো লোকসমূহের ছড়াছড়ি। অ্যাশবিনের পাশে, সোফার কাছে, থামের ওপরে— সবখানেই সুন্দর সাজানো রয়েছে ইনডোর প্লান্টসগুলো। একদিকে একটি বিরাট ওয়াল ক্লক। সেখানে বিশ্বের প্রধান প্রধান শহরের বর্তমান সময় একই সঙ্গে সূচিত হচ্ছে। ঘড়ির দেশ সুইজারল্যান্ডের বিরাট বিজ্ঞাপন এটি।

আর এসব ছাড়াও সেই লাউঞ্জে রয়েছে ডিউটি-ফ্রি শপ। যেখানে অতি শস্তায় পাওয়া যায় পৃথিবীর সেরা ঘড়িগুলো— প্যাটেক ফিলিপ, ইয়েগার এবং অন্যান্য নামী ঘড়িগুলো—ওমেগা, রোলেক্স, ফারভা লুবা ইত্যাদি।

মিস্টার আবু নসর মোহাম্মদ ইজ্জতুল্লাহ আহমদ জুরিখ এয়ারপোর্টে, ডিউটি-ফ্রি শপ, ওমেগা, রোলেক্স প্রভৃতির কথা ভেবে চান্দা হয়ে উঠলেন।

বাঙালি মুসলমান তাঁর নাম বাংলায় রাখেন না।

রাখেন আরবি - ফার্সীতে যার উচ্চারণ এবং বানান সাধারণত অশুদ্ধভাবে করা হয়। নামকরণের সময় একটি চোস্ত অর্থপূর্ণ নাম দেন তাঁদের পুণ্যবান গুরুজনরা-কিন্তু সে নামের অর্থ জানেন না অনেকেই। আর যদিও তার নাম রাখা হয় আরবিতে, তা বানান করা হয় ইংরেজিতে।

মোহাম্মদকে বলেন এমডি। যেমন, জনাব আবু নসর মোহাম্মদ ইজ্জতুল্লাহ আহমদ তার নাম বলেন মিঃ এ.এ.এম. ইজ্জতুল্লাহ আহমদ। কিন্তু যেহেতু তার নামটি বৃহদাকায় সেহেতু তার পরিচিতরা ওকে শুধু ইজ্জতুল্লাহ বলেই ডাকেন।

মগবাজারে তার বিরাট বাড়িটির ড্রয়িং রুমে বসে বসে ইজ্জতুল্লাহ ভাবছিলেন জুরিখের কথা। ভেবে ক্রমশ তিনি সন্তি লাভ করছিলেন।

হাতের সিগারেটটি তিনি পাশের টিপয়ের ওপর রক্ষিত কাচের অ্যাশট্রেতে সজোরে চেপে নিভিয়ে দিলেন।

মনে পড়লো এর আগের বছর তিনি যখন ইওরোপে যান তখন এই অ্যাশট্রেটি কিনেছিলেন জুরিখ এয়ারপোর্টের সেই ডিউটি-ফ্রি শপ হতে।

কি সুন্দর এই নীলাভ কাচের দ্রব্যটি।

একদিকে সিগার রাখার স্থান। আরেক দিকে সিগারেটের। মাঝখানে শাদা ছাপে কোনো একটি সুইস ক্যান্টনের প্রতীক - বোধহয় জুরিখেরই।

প্রতি বছরই ইজ্জতুল্লাহকে যেতে হয় বিদেশে। কোনো বছর দু'তিনবারও যেতে হয়েছে। মাঝে মাঝে তিনি ক্ষেদোক্তি করেছেন।

অল্‌ দ্যাট এয়ার ট্রেনেল ইস সো সিকেনিং। এবার না যেতে হলে বেঁচে যেতাম। বড়ো টায়ার্ড হয়ে পড়েছি। এই বয়সে আর এসব চলে না।

এই টুকুন বলে তিনি বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দের কাছ হতে সমবেদন্যর আশায় তাকিয়ে থাকতেন। কিন্তু তারা ভালোভাবেই জানেন ইজ্জতুল্লাহ বিদেশযাত্রার কোনো সুযোগই হাতছাড়া করবেন না। কেননা প্রতি যাত্রা উপলক্ষ্যেই উনি পেয়ে থাকেন মোটা ডলার অথবা স্টার্লিং অ্যালাউন্স- যার সদ্ব্যবহার তিনি করেন বিদেশ থাকাকালীন এবং স্বদেশে ফিরে আসেন একরাশ তৈজশপত্র এবং উপহার সামগ্রী নিয়ে। ইজ্জতুল্লাহর বাড়িমাঠ তাই মেলা দেশের চোখ ঝলসানো বহু জিনিসের ছড়াছড়ি।

তিনি অদূরে দেয়ালের গায়ে ঝোলানো প্যান অফ আমেরিকান এয়ার লাইন্সের বিরাট ক্যালেন্ডারটি দিকে তাকালেন।

অর্ধেক পাতায় একটি সুশ্রী তরুণীর ছবি।

তার নিচে লেখা নাইনটিন-সিস্ট্রটি-নাইন।

জানুয়ারি মাস।

ছাশ্বিশ তারিখ হচ্ছে রোববার।

সেদিন তার জুরিখ পৌছুনোর কথা।

আগামী কাল শনিবার বিকেলে ঢাকা ছাড়ার কথা।

তার ফ্লাইট নাম্বার পি কে ফোর ফাইভ সেভেন।

আজ শুক্রবার।

চম্বিশে জানুয়ারি।

এখন সন্ধ্যা।

সারাদিনের ঘটনাপ্রবাহে ইজ্জতুল্লাহ বিচলিত ও চিন্তিত ছিলেন।

কিন্তু ক্রমশই তিনি শান্তি ফিরে পাচ্ছিলেন উক্ত ফ্লাইট এবং জুরিখের কথা কল্পনা করে।

একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান মিঃ ইজ্জতুল্লাহ আহমদ। উন্নয়ন দশকে দেশের উন্নতিতে তার এবং তার প্রতিষ্ঠানের দান কম নয় একথা তিনি প্রায়ই জোর গলায় ঘোষণা করেন।

গেল বছর আর সব সরকারি প্রতিষ্ঠানের মতোই তার প্রতিষ্ঠানের ওপরে সংবাদপত্রে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিলো। হাজার বিশেক টাকা খরচ হয়েছে। পরিবর্তে *মর্নিং নিউজ*, *অবজারভার* প্রভৃতি পত্রিকায় প্রেসিডেন্ট, গভর্নর এবং মন্ত্রীদের ছবি ও বাণীর পাশে মুদ্রিত হয়েছে তার নিজের ছবি ও একটি প্রবন্ধ।

প্রবন্ধটি অবশ্য তিনি নিজে লেখেন নি। তার লেখার সময় নেই। ওটি লিখেছিলো, তারই অফিসের কর্মচারি সেলিম জামান।

সেলিম জামান এককালে প্রগতিশীল ছাত্র বলে সুপরিচিত ছিলো। কোলকাতার বামপন্থী একটি মাসিক পত্রিকায় তার দু'টি কবিতা ছাপা হয়েছিলো। ইকনমিকসে এম.এ. পাশ করে আপাতত এই সরকারি সংস্থায় কাজ করছে। সাহিত্য-চর্চা আজো সে ছাড়েনি। দৈনিক পাকিস্তানে মাঝে মাঝে লেখে এবং চেয়ারম্যান ইজ্জতুল্লাহর প্রয়োজন হলে প্রবন্ধ লেখে।

সেলিম জামানের রচনাশৈলীর ওপর ইজ্জতুল্লাহর গভীর শ্রদ্ধা এবং অটুট বিশ্বাস। তার প্রতিষ্ঠানের সুপরিচিত জিংগল 'শিল্প এলো দেশে, উঠলো সবাই হেসে' - সেলিম জামানের কল্পনা প্রসূত। এছাড়া, দেশের অর্থনীতি হতে শুরু করে আয়ুবভূতি পর্যন্ত সেলিম জামানের লেখা সব প্রবন্ধই ইজ্জতুল্লাহর জন্যে এনেছে প্রচুর প্রশংসা। সেক্রেটারিয়েটের দু'চারজন কনটেম্পোরারি কৌশলে জানতে চেয়েছেন প্রকৃত লেখকের নাম। কিন্তু তিনি অতি সতর্ক থেকেছেন সে বিষয়ে। তিনি জানেন, সেক্রেটারিয়েট, গভর্নমেন্ট হাউস, প্রেসিডেন্টস কমিউনিটি, সর্বত্রই সেলিম জামানের মতো লেখকের খুব চাহিদা। তাছাড়া কর্মচারি হিসেবে সে খুবই নির্ভরযোগ্য এবং বেশ দক্ষ। ইজ্জতুল্লাহ তাই সময় অসময়ে তার পরামর্শ নিয়ে থাকেন। আজো সকালে নিয়েছিলেন।

আজ সকাল অবিশ্যি অন্যান্য দিনের সকারে মতো ছিলো না। সর্বদলীয় ছাত্র পরিষদ না সংগ্রামী পরিষদের - নামটা ঠিক ইজ্জতুল্লাহ মনে করতে পারছিলেন না - সমর্থনে ডেমক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি শহরে পূর্ণ হরতালের আহ্বান জানিয়েছিলো।

মঙ্গলবারে আসাদুল্লাহ নামে এক ছাত্রের পুলিশের গুলিতে মৃত্যুর প্রতিবাদে এবং ছাত্রদের এগারো দফার দাবিতে এই হরতাল।

ইজ্জতুল্লাহর ভাসা ভাসা আইডিয়া ছিলো ঘটনাটি সম্পর্কে। গত কয়েকদিন খুব হৈ চৈ হয়েছে শহরে কয়েকটি মৃত্যু উপলক্ষ্যে। গত সন্ধ্যায় ছাত্ররা টর্চ লাইট প্রোসেশন নাকি করেছে। কিন্তু আইন ও শৃঙ্খলা অমান্যকারী ছাত্র ও জনতার ওপরে পুলিশ যদি আত্মরক্ষার্থে গুলি চালিয়েই থাকে তাতে এতো উত্তেজিত হওয়া তিনি অনুচিত বলে মনে করেছেন। দায়ী করেছেন বেঙ্গলি

ইমোশনালিজমকে।

রাজনীতি বিষয়ে মিঃ ইজ্জতউল্লাহর মতবাদ সুস্পষ্ট। তিনি নির্ভীক ভাবে বলেন যে তিনি ডেমক্রেসিতে বিশ্বাস করেন। বিগত দশ বছরে দেশে একটা স্থিতি এসেছে। ধীর গতিতে হলেও দেশ ধাপে ধাপে প্রগতির পথে এগুচ্ছে। সুতরাং বর্তমান ব্যবস্থা অব্যাহত ভাবে চালু রাখাই তিনি দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক বলে বিশ্বাস করেন।

বলাবাহুল্য তাঁর এই মতবাদ দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হোক বা না হোক তার নিজের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়েছিলো।

মিঃ ইজ্জতউল্লাহ তাই আজ এতো বড় এক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান। গভর্নমেন্ট হাউস হতে শুরু করে ইন্টারকন্টিনেন্টাল পর্যন্ত সব অনুষ্ঠানেই তাকে গণ্যমান্যদের মধ্যে উপস্থিত দেখা যাবে এ কথা নিশ্চিত। দু'টি খেতাবও পেয়েছেন ইতিমধ্যে। বাড়ি এবং গাড়ি হয়েছে। প্রচুর বিদেশ ভ্রমণ করেছেন। বয়েস এখন তার প্রায় পঞ্চাশ। সুতরাং আরো উন্নতির সময় রয়েছে। চুল তার বেশ পাতলা হয়ে গেছে কিন্তু বেশি পাকেনি। চোখে ভারি ফ্রেমের চশমা। মোটাসোটা কালো গড়ন। কাপড়-জামায় সবসময় ফিটফাট থাকেন। মাঝে মাঝে অফিসে হ্যাট পরেও যান।

মগবাজারে এই বাড়িটিতে তিনি ছাড়া অন্যান্য অধিবাসী হচ্ছেন তার স্ত্রী মিসেস রোকেয়া আহমদ এবং তার দুটি কন্যা ও দুটি পুত্র। কন্যাদয়, মাহেলা ও শাহেলা হোলিফ্রস কলেজের ছাত্রী। প্রথম পুত্র ইমতিয়াজ ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট ইয়ারে আর দ্বিতীয় পুত্র ইফতিখার সেন্ট জোসেফ স্কুলে। অঙ্কের মতো ভালোবাসেন তার পুত্র কন্যাদের মিঃ ইজ্জতউল্লাহ। তবে মিসেস আহমদ হাসতে হাসতে বলতেন যে ইজ্জতউল্লাহ চারজনকেই ভালোবাসলেও সমপরিমাণে সবাইকে ভালোবাসেন না। বলতেন, ইমতি তোমার মতোই চেহারা পেয়েছে কিনা, তাই ওর একটু বেশি দাম তোমার কাছে।

ডোন্ট টক ননসেন্স রোকেয়া।

ছোটো তিরস্কারে ইজ্জতউল্লাহ এই অভিযোগ উড়িয়ে দিতে চাইতেন। কিন্তু পারতেন না। তিনি জানতেন তাঁর স্ত্রীর এই উক্তি মিথ্যে নয়। সত্যিই ইমতিয়াজের সঙ্গে তার নিজের অল্প বয়সের ছবি হুবহু মিলে যায়। তিনি নিশ্চিত যে উত্তরকালে ইমতিয়াজ অবিকল তার মতোই হবে দেখতে। কিন্তু শুধু সে কারণেই নয়। অন্যান্য কারণেও তার দৃষ্টি ছিলো ইমতির প্রতি। আর তিনজনের মতো নয় এই ছেলেটি, বয়েসের তুলনায় একটা বেশি ধীর ও স্থির। স্বল্পভাষী। বেশতৃষায় অমনোযোগী।

মাঝে মাঝে ইজ্জতউল্লাহ এই জন্যে বিরক্ত এবং হতাশা বোধ করেছেন। যেমন এবার ইউরোপ হতে ফেরার সময় কি আনতে হবে তার একটি লিষ্ট যখন মিসেস আহমদ দিলেন তখন দেখা গেলো সেই লিষ্টে মিসেস আহমদ, মাহেলা, শাহেলা, ইফতিখার প্রত্যেকেরই নামের নিচে নানাবিধ জিনিসপত্রের নাম। অথচ ইমতির নাম তাতে নেই। মিঃ ইজ্জতউল্লাহ প্রশ্ন করেছেন স্ত্রীকে।

তোমার লিষ্টে আমার নামও দেখছি আছে। ইমতির নাম কোথায় গেলো? ও কিছু আনতে বলেনি?

সে কথা তোমার চোখের মণিকেই জিজ্ঞেস করো না কেন? আমার সঙ্গে দিনের মধ্যে যে কটা

কথা হয় তাতো আঙুলে গোপা যায়। সন্ধ্যোসী হওয়ার ওর আর বাকি নেই।

রোকেয়া পান্টা উত্তর দিয়েছেন। ইজ্জতুল্লাহ অবশ্য জানেন ইমতি কিছুই বলবে না। ওর কোনো আশ্রয় নেই। হয়তো দু'একটি বই আনলে খুশি হবে। কিন্তু এবারের ট্রিপে তিনি বেশ ভালো করেন এন্ট্রি পাবেন। তাছাড়া তাঁর সংস্থায় নিয়োজিত করেন কনসালটেন্টসের মাধ্যমে আরো কিছু ডলার যোগাড় করেছেন। সুতরাং এবার তিনি ভালোভাবে বাজার করবেন স্থির করেছেন। ইমতির হাতে যে ঘড়ি সেটি তার পরিত্যক্ত পুরনো মডেলের ঘড়ি। ইজ্জতুল্লাহ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবার জুরিখের সেই এয়ারপোর্ট হতে ইমতির জন্যে একটা ওমেগা সি-মাষ্টার অথবা রোলেক্স অয়স্টার ঘড়ি নিয়ে আসবেন। চমৎকার মানাবে ইমতির হাতে।

কিন্তু আজকের ঘটনা সমষ্টি ইজ্জতুল্লাহকে শারীরিক দিক দিয়ে পীড়িত করেছে। কারণ তাকে হেঁটে যেতে হয়েছে বাড়ি হতে অফিসে এবং ফিরেও আসতে হয়েছে হেঁটে। এই ব্যয়েসে এতোটা পথ যে তিনি হাঁটতে পারবেন একথা তিনি নিজেও ভাবতে পারেন নি গতকাল রাতে।

শুক্রবার ভোর বেলায় পথে যখন বেরুলেন তখন দেখলেন বিভিন্ন অফিসের কর্মচারি সব হেঁটে চলেছেন। মাঘ মাসের সকাল। তাই যতোটা পরিশ্রম হবে ভেবেছিলেন ততোটা হলো না। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং ছাত্র সমাজের দায়িত্বহীনতার ভয়াবহ ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে করতে অফিসে পৌঁছে গিয়েছিলেন তিনি।

তার নিজের ঘরে প্রবেশ করে একটু বিশ্রাম নিলেন তিনি। টেবলের ওপরে সেক্রেটারি রেখে গেছে আজকের অবজার্ভার। হাঁটার ক্লান্তির পর কাগজে স্ট্রাইক সম্পর্কিত খবরের হেড লাইন তার কাছে বিষয় মনে হলো। দ্রুত চোখ বুলিয়ে পত্রিকাটি তিনি শেলফের পরে রেখে দিয়ে কলিং বেল টিপলেন।

সেলিম জামানকে তলব করলেন।

তার বয়স তিরিশের কিছু বেশি। রোগা লম্বা আকৃতি। ছাই রংয়ের টেরিফর্মের এক আটসাঁট সুট পরনে। ইজ্জতুল্লাহ তাকে প্রশ্ন করলেন, স্টাফ অ্যাটেনডেন্স কি স্বাক্ষর আজ?

প্রায় সবাই স্যার এসে গিয়েছে। যারা দূরে থাকেন তারা এখনো আসেননি। কিছুক্ষণের মধ্যে এসে যাবেন নিশ্চয়ই।

হরতালের খবর কি?

হরতাল কমপ্রিট স্যার। সব দোকানপাট যানবাহন বন্ধ। মতিঝিলের প্রাইভেট ফার্মগুলোও প্রায় সবই বন্ধ। শুধু গভর্নমেন্ট অফিসগুলোই খোলা। তবে তাও সব নয়।

সব নয় মানে?

কিছু কিছু অটোনমাস বড়ির চেয়ারম্যান গোলমাল এড়ানোর জন্যে ছুটি দিয়ে দিয়েছেন। ডিআইটি, ইপিওয়াপদা ইত্যাদি। স্যার, একটা কথা বলবো?

কি?

পাবলিকের মুড খুব খারাপ স্যার।

পাবলিক? পাবলিক কারা?

মানে স্যার ছাত্র জনতারা।

তুমি বলতে চাও পথের সব আর্চিনরা ছাত্র-জনতা? কতোগুলো ন্যাটো চ্যাংডার দল ইট

পাটকেল ছুঁড়লেই ছাত্র-জনতা হয়ে গেলো?

উত্তেজিত ইজ্জতুল্লাহ একটু দম নিয়ে আবার প্রশ্ন করলেন :

কি? কিছু বলছো না যে?

না স্যার। ভাবছিলাম -

আহা, যা ভাবছিলে তাই বলা না কেন?

স্যার। ওই ন্যাংটো ছেলেমেয়েদের জন্মও পথে আর মানুষও হচ্ছে পথে। পথের আন্দোলনে ওরাই তো থাকবে।

সেলিম জামানের উজ্জ্বল আর্থিক সত্যতা ইজ্জতুল্লাহ মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন।

এই উঁচু অফিস ভবনে তার কক্ষ হতে দেখা যায় কিছু দূরেই চাটাইয়ের অজস্র ছাউনি, যার আশেপাশে সব সময়ই ছড়িয়ে থাকে অর্ধ উলংগ আর অনাহারী শীর্ণদেহী বাচ্চার দল। তিনি চুপ করে থাকলেন। কিন্তু সেলিম জামান আরো বলে চললো :

তাছাড়া এ আন্দোলনের নেতৃত্ব যে ছাত্ররা দিচ্ছে একথা সবাই স্বীকার করে নিয়েছেন। এ হরতালের কারণ স্যার ছাত্রদের এগারো দফার দাবি। ওদের কাজ দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। আমি স্যার আজিমপুরের ওদিকেই থাকি। ইউনিভার্সিটি এরিয়ার পথে ঘাটে যে রকম ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছে সে দেখবার মতো। কংক্রিটের বড়ো বড়ো পাইপ, টেলিফোন পোস্ট, ডাস্টবিন, সব স্যার রাস্তায় আড়াআড়িভাবে সাজিয়ে দিয়ে রোড ব্লক তৈরি করা হয়েছে। নাইনটিন ফিফটি টু প্রতিবেদন এ রকম অরগানাইজড মুভমেন্ট দেখা যায়নি।

এমন হলো কেন এবার তাহলে?

প্রশ্ন করেই ইজ্জতুল্লাহ বুঝলেন যে সেলিম জামান এর ফলে তাকে একটি নির্বোধ মনে করতে পারে। কিন্তু প্রশ্নটা করে ফেলেছেন বলে মনে মনে স্বস্তি পেলেন। কারণ সেলিম জামানের কাছ হতে সঠিক উত্তরটি পাবেন বলে। ছাত্র আন্দোলন তার কাছে চিরকালই এক দুরূহ অংকের মতো মনে হয়েছে। সেলিম জামান উত্তর দিলো :

তখন স্যার আন্দোলন ছিলো ভাষা বাঁচানোর। আর আজকের এ আন্দোলন জীবন বাঁচানোর আন্দোলন। এ আন্দোলন সাধারণের পক্ষে বোঝা সহজ। সে জন্মের ছাত্রদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে অগুণতি জনতার মিছিল। নারায়ণগঞ্জ, ডেমরা, টাঙ্গাইল, শ্রীমঙ্গল ইত্যাদি হতে ঢাকায় যে শুধু মিছিল আসছে তা নয় স্যার। দেশের বহুস্থানেই সংঘবদ্ধ বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এবার যে আগুন জ্বলেছে তা আমাদের সবাইকেই স্পর্শ করবে স্যার।

সেলিম জামান যেন এক ভবিষ্যদ্বাণী করলো। ইজ্জতুল্লাহ একটু অবস্তি বোধ করলেন। টেলিফোনটা হঠাৎ বেজে ওঠায় রিসিভারটা তুলে নিলেন। কোনো এক অদৃষ্ট কর্মচারির কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। সব শুনে তিনি রিসিভার রেখে দিলেন যথাস্থানে। তার ফ্যাকাশে মুখ দেখে সেলিম জামান প্রশ্ন করলো :

কি হয়েছে স্যার?

আমাদের বিলডিংয়ের সামনে নাকি বিরাট পিকেটিং হচ্ছে এবং স্টাফদের বেরিয়ে আসার জন্যে প্লোগান দিচ্ছে। বেরিয়ে না এলে বিলডিং অ্যাটাক করবে বলেছে। আরো শুনলাম ইডেন বিলডিংয়ের চারপাশেও নাকি একই রকম হৈ-চৈ হচ্ছে।

সেলিম জামান তাড়াতাড়ি জানালার পাশে গিয়ে নিচে পথের দিকে তাকিয়ে দেখলো প্ল্যাকার্ড

এবং কালো পতাকাবাহী বিক্ষুব্ধ জনতার ভীড়। সেখান হতে দাঁড়িয়েই সে বললো :

স্যার গতকাল খুব সুবিধে মনে হচ্ছে না। অফিস ছুটি দিয়ে দিলেই ভালো হবে। কোনো ক্ষতি হবে না আপনার স্যার।

আঁ্যা, তুমি ঠিক বলছো তো?

ঠিকই বলছি স্যার।

বেশ। বেশ। সবাইকে চলে যেতে বলো তাহলে।

ইজ্ঞাউল্লাহ নিজেও চলে এসেছিলেন কিছু পরে। সেক্রেটারিয়েটের সামনে গুলি চলার খবর পাওয়ার পর তিনি আর থাকেন নি অফিসে।

এখন সন্ধ্যা বেলা।

বিকেলে ইমতি এসে খবর দিয়েছে মর্নিং নিউজ ও দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকা অফিস এবং আরো কয়েকটি স্থানে জনতা অগ্নিসংযোগ করেছে ইপিআরের গুলি বর্ষণ সত্ত্বেও।

কিন্তু শুধু সে খবরগুলোই নয়। আজ সকালে সেলিম জামানের কথাগুলো তাকে আরো বেশি ভাবাক্রান্ত করেছিলো। মগজের মধ্যে একরাশ জ্ঞানাকি যেন পূরে দিয়েছে ও। পোকাগুলো অনির্দিষ্টভাবে এদিক থেকে ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। জ্বলছে আর নিতছে। ইজ্ঞাউল্লাহর চিন্তাধারা দিগভ্রান্ত হয়ে পড়ছিলো। হারিয়ে ফেলছিলেন যেন তার বিশ্লেষণী শক্তি। ভাগ্যিস জুরিখ যাত্রা ঠিক ছিলো নইলে তিনি হয়তো পাগল হয়ে যেতেন। তিনি ভাবলেন আগামী কালই তার মুক্তি হবে এ অসহনীয় মানসিক অবস্থা হতে। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি তার প্রেনের টেক অফের।

হঠাৎ বাইরে সজোরে এক সাইকেলের পতনের শব্দ হলো। ইমতি ঘরে ঢুকলো। ভীষণ উত্তেজিত গলায় সে তাড়াতাড়ি বললো :

‘কারফিউ হয়ে গিয়েছে সারা শহরে। কারফিউ। আজ রাত আটটা থেকে কাল রাত আটটা পর্যন্ত! চব্বিশ ঘণ্টার কারফিউ। মাইকে অ্যানাউন্স করে যাচ্ছে সবাইকে ঘরে ফেরার জন্যে। আটটার পর কাউকে পথে দেখলেই নাকি মিলিটারি গুলি করবে।’

ইমতিয়াজ রুদ্ধশ্বাসে সব জানিয়ে দিলো। ততক্ষণে বাড়ির আর সব ছেলেমেয়েরা ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। মিসেস আহমদও ইমতির গলা শুনে ওপর হতে নেমে এসেছেন। মিঃ ইজ্ঞাউল্লাহ লাফ দিয়ে উঠলেন তার সোফা হতে।

মাই গড। কাল সন্ধ্যা আটটা পর্যন্ত?

হ্যাঁ আশ্চা।

ইজ্ঞাউল্লাহ তাড়াতাড়ি টেলিফোন ডিরেক্টরিটা ভুলে নিলেন। দ্রুত হাতে পাতা উল্টে ওভারসিঙ্ক ট্রাংক কল বুকিংয়ের নাম্বার বের করে মিসেস আহমদকে বললেন, জিরো-ওয়ানে ফোন করে এখনি জুরিখে একটা কল বুক করো। পাকিস্তানের রিগ্রেশনসেন্টেটিভ না থাকলে এ কনফারেন্সই হবে না। আমার ফ্লাইংয়ের আনসার্টেনটি ওদের এখনি জানিয়ে দেয়া উচিত। ওহ, হোয়াট এ মেস ইটস গোয়িং টু বি।

ধপাস করে তিনি আবার বসে পড়লেন। মিসেস আহমদ ডায়াল করে যে উত্তর পেলেন তাতে আরো দমে গেলেন তিনি। অপারেটর জানিয়েছেন জুরিখে কলের জন্যে লাইন পাওয়া যায় কেবল মাত্র সার্কিট আওয়ার্সে - অর্থাৎ সকাল নয়টা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত। একজন নাকি গত দুদিন

ধরে অপেক্ষা করছেন। ইজ্জতুল্লাহ কল বুক করতে পারেন কিন্তু কানেকশন কখন পাবেন তা বলা অসম্ভব। মিসেস আহমেদ বললেন, এখন উপায় কি তাহলে?

উপায় আর কিছুই নেই। আমি যদি জুরিখে থবর না দিতে পারি তাহলে কাল বিকেলের ফ্লাইটে আমাকে যেতেই হবে। আই কানট লেট দেম ডাউন।

কিন্তু যাবে কি করে এয়ারপোর্টে?

ব্যবস্থা কিছু করতেই হবে। আচ্ছা তুমি পি-আই-এতে ফোন করো তো।

মিসেস আহমদ সেখানে ফোন করেও নিরাশ হলেন। কারফিউয়ের আকস্মিকতায় ওদের অফিসে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। আগামীকাল সকালে ফোন করতে জানালো তারা। ততক্ষণে নিশ্চয়ই ট্রান্সপোর্টেশনের একটা ব্যবস্থা তারা করতে পারবেন।

রাতে মোটেই ঘুমুতে পারলেন না ইজ্জতুল্লাহ। মিসেস আহমদ তার নিজের ঘুমের ব্যাঘাত হওয়াতে স্বামীকে অ্যাসপিরিন খাবার উপদেশ দিলেন। ইজ্জতুল্লাহ দুটি ট্যাবলেট গলাধঃকরণ করে শুয়ে রইলেন। সকালে ব্রেকফাস্টের পর তিনি আবার ফোন করলেন পি-আই-এতে। কিন্তু হতাশ হলেন জেনে যে ওরা এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে পারবে না। ওদের একটি বাস গতকাল জনতার আক্রমণে অচল হয়ে পড়েছে। ইজ্জতুল্লাহকে ওরা উপদেশ দিলো কমিশনার্স কন্ট্রোল রুমে ফোন করবার জন্যে। সেখান হতে কারফিউ পাস ইস্যু করা হচ্ছে।

বিরাট আশা নিয়ে কয়েকবার তিনি কমিশনার্স কন্ট্রোল রুমে ডায়াল করে এনগেজড টোন পেলেন। কিন্তু চেষ্টায় বাধা দিলেন মিসেস আহমদ, কারফিউ পাস তো ওরা ইস্যু করছে। কিন্তু আনতে যখন যাবে তখন তো আর পাস থাকবে না তোমার।

তা থাকবে না। কিন্তু মিলিটারিদের বললে নিশ্চয়ই আমাকে ওরা কমিশনার্স অফিস পর্যন্ত যেতে দেবে। নইলে কেউ পাস পাবে কি করে?

কিন্তু তোমাকে যেতে দিচ্ছে কে? এই রকম গোলমালের মধ্যে তুমি যেতে চাইলে কি আমি যেতে দেবো? কখন কে কোথায় গুলি চালিয়ে দেয় বলা যায় নাকি? না। গাড়ি দেখলে নিশ্চয়ই ওরা থামিয়ে জিজ্ঞেস করবে।

সে কথা আমি জানি না। আমার বাপু কারুর ওপর বিশ্বাস করেন। তুমি বেরুতে পারবে না।

মিসেস আহমদ ফাইনাল রায় দিয়ে দিলেন। কিন্তু ইজ্জতুল্লাহ হাল ছাড়লেন না। হঠাৎ মনে পড়ে গেলো তার এক দূরসম্পর্কের ভাইপো মেজর ইসলামের কথা। এবোটাবাদ থেকে ছুটিতে এসেছে। এখন ধানমন্ডিতে আছে। ফোন করলেন তাকে।

এতোক্ষণে আশার আলো দেখতে পেলেন ইজ্জতুল্লাহ। মেজর ইসলাম তাকে আশ্বাস দিলেন যে সে নিশ্চয়ই একটি ব্যবস্থা করবে হেড কোয়ার্টার্সের সঙ্গে যোগাযোগ করে।

দুপুরের দিকে মেজর ইসলাম ফোন করে জানালেন সব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। একটি আর্মড জিপ আসবে তাকে নিয়ে যেতে বেলা তিনটের সময়। সঙ্গে একটি পাসও থাকবে ইজ্জতুল্লাহর জন্যে।

জিপ ঠিক এসে গেলো তিনেটর সময়। ড্রাইভার এবং একটি রাইফেলধারী। ইজ্জৎউল্লাহ প্রস্তুতই ছিলেন। তবু আরেকবার পাসপোর্ট, টিকেট, ট্রাভেলার্স চেক ইত্যাদি সব দেখে নিয়ে স্যুটকেস এবং ব্রিফকেস নিয়ে জিপে উঠলেন সবার কাছ হতে বিদায় নিয়ে।

জিপ ছুটে চললো শহরের মাঝ দিয়ে। কিন্তু এ শহর আগে দেখেছেন বলে বিশ্বাস হতে চাইলো না ইজ্জৎউল্লাহর!

মাঝে মাঝে ট্রাকের ওপর অলস ভঙ্গিতে বসে আছে কতোগুলো সৈন্য। আর কতোগুলোর হেলমেটে লতাপাতার ক্যামোফ্লেজ কেন তিনি তা বুঝলেন না। ভাবলেশহীন ভাবে ওরা তাকিয়ে আছে।

কেউবা দু'একটি প্রাইভেট গাড়ি, যারা পাস নিয়ে বেরিয়েছে, তাদের থামিয়ে প্রশ্ন করছে। ট্রাফিক লাইটে লাল সবুজ বাতিগুলো অকারণে জ্বলছে। কয়েকটি শালিক রাস্তায় জটলা করছিলো। ওরা স্বাধীন।

জিপের শব্দে হঠাৎ সব এক ঝাঁক উড়ে গেলো।

হহ করে জিপ একটির পর একটি ট্রাফিক লাইট পেরিয়ে যেতে থাকলো। একটি অ্যাম্বুলেন্স ওদের ওভারটেক করে গেলো।

শহরে কোনো বাসিন্দা নেই যেন।

সবগুলো দোকান পাটের ঝাঁপ নামানো। বাড়িগুলোর দরোজা জানালা বন্ধ। প্রাণ অর শব্দের অনুপস্থিতিতে শহরটার যেন মৃত্যু হয়েছে বহু বছর আগে।

ভীষণ এক অমঙ্গলের চিন্তা শাদা কাফনের মতো ইজ্জৎউল্লাহর মনকে ঢেকে দিলো।

এয়ারপোর্টে এসে ইজ্জৎউল্লাহ দেখলেন গুটি কয়েক যাত্রী এসেছেন। তারা কিস্তাবে এসেছেন জানতে খুব কৌতূহল বোধ হলো তার। কিন্তু তিনি কোনো প্রশ্ন করলেন না।

চেক ইন করলেন তিনি। কাউন্টারের ক্লার্ক তাকে বোর্ডিং টিকেট দিয়ে ব্যাগেজে দুটি ট্যাগ লাগিয়ে দিলো। লাউঞ্জ গিয়ে বসলেন তিনি। টারম্যাকে যে বোয়িং ৭৪৭-এ আছে কিছু পরেই সেটি তাকে নিয়ে টেক অফ করবে। তিনি তাকিয়ে দেখলেন পি-আই-এর এঞ্জিনিয়াররা তদারকি করছেন বোয়িংটির। নিশ্চিত হলেন তিনি।

এ সপ্তাহের টাইম ম্যাগাজিনে প্যারিসে ভিয়েটনামের বৈঠক সম্পর্কে একটি বিশদ প্রবন্ধ আছে। ইজ্জৎউল্লাহ সেটি পাঠে মনোনিবেশ করলেন।

ঘন্টাখানেক পরে অ্যানাউন্সমেন্ট হলো ফ্লাইট ফোর ফাইভ সেভেনের যাত্রীদের প্লেন অভিমুখে অগ্রসর হবার জন্যে।

সাময়িকীটি ব্রিফকেসে ঢুকিয়ে রেখে তিনি এগলেন অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে।

কিন্তু ইজ্জৎউল্লাহ লাউঞ্জের দরজা পেরুতে পারলেন না। পি-আই-এর একজন কর্মচারি হঠাৎ এসে তাঁকে প্রশ্ন করলো :

এক্সকিউজ মি। আপনি কি মিঃ ইজ্জৎউল্লাহ আহমদ?

হ্যাঁ। কেন?

আপনার নামে আমরা এই মাত্র একটি জরুরী মেসেজ পেয়েছি। পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমেও ডাকা হচ্ছে আপনাকে।

ইজ্জতুল্লাহ মন দিয়ে শুনলেন।

হ্যাঁ ঠিকই।

অ্যাম্পলিফায়ার হতে অনুরোধ ঘোষিত হচ্ছে তাকে ইনফর্মেশন ডেস্কে যাবার জন্যে।

কিন্তু প্লেন যে টেক অফ করছে।

দেখুন সংবাদটা খুবই জরুরি। আপনি তাড়াতাড়ি কাউন্টারে আসুন।

ইজ্জতুল্লাহ বাধ্য হলেন কর্মচারিটিকে অনুসরণ করতে। ইনফর্মেশন ডেস্কে গেলেন।

সেখানে তিনি সংবাদটি পেলেন।

তার বাড়ি হতে মিসেস আহমদ ফোনে জানিয়েছেন ইমতিকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। ইজ্জতুল্লাহ বেরিয়ে যাবার কিছু পরই ইমতি অদৃশ্য হয়েছে। কাউকে জানায়নি কোথায় সে গিয়েছে। আর কিছু আগেই নাকি কারফিউ অমান্যকারীদের ওপর গুলি চলেছে। মগবাজারে না কোথায় তা জানা যায়নি। মিসেস আহমদের অনুরোধে ইজ্জতুল্লাহকে বাড়ি ফিরিয়ে নেবার জন্যে জিপ আসছে।

কাউন্টার ক্লার্ক ঠান্ডা স্বরে সংবাদগুলো জানিয়ে দিলো। ইজ্জতুল্লাহ নিশ্চল হয়ে রইলেন।

অদূরে বোমিংয়ের এঞ্জিন তখন ওয়ার্ম আপ করছে। বিকট শব্দ সারা এয়ারপোর্ট ছেয়ে ফেলেছে। দৈত্যের মতো বিরাট ওই যন্ত্রটি এখনি ধাবিত হবে রানওয়েতে আকাশের মুখে।

কিন্তু প্র্যাট অ্যান্ড হইটনির নির্মিত জেট এঞ্জিনের কর্ণবিদারী গর্জন ইজ্জতুল্লাহ একটুও শুনতে পাচ্ছিলেন না।

প্লেন।

এয়ারপোর্ট।

এয়ারপোর্ট বিল্ডিং।

প্যাসেঞ্জার লাউঞ্জ।

ইনফর্মেশন ডেস্ক।

কাউন্টার ক্লার্ক। লোডার। লাগেজ।

এসব কিছুই তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না।

তার মস্তিষ্কে তখন কেবল মাত্র একটি চিন্তা ক্রাজ করে চলেছে। তিনি ভাবছিলেন সেলিম জামানের ভবিষ্যদ্বাণী তার নিজের জীবনেই কি এমনি মারাত্মকভাবে প্রমাণিত হবে? সত্যিই কি কারুর মুক্তি নেই এই দাবানলের শিখা হতে?